একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

দ্বাবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

১৮৫১ শক

কলিকাতা

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড
আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩৬। খৃঃ ১৯২৯।৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী।

ষড়্বিংশ কল্প, তৃতীয় ভাগ।

১৮৫১ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অঞ্জলি	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
বিজয়দাতা দেবতা ১ ; কল্যাণকর দেবতা ২ ; বন্ধু দেবতা ৩১ ; বন্ধু দেবতা ৩০ ; জ্যোতির্ম্ময় দেবতা ১০১ ; নেতা দেবতা ১৬১		
অধিবাসন (কবিতা)	শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস ...	৩১২
অন্যান্য জাতির প্রতি ন্যায়পরতা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭১
আগে চল্, (শোভাযাত্রার গান স্বরলিপি-সহ)	(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ডাঃ শ্রীবাণী দেবী ...	৩০৮
আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৫০
আদিব্রাহ্মসমাজের আয়ব্যয় ১৮৫০ শক		২৮
আরাধনা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২১৮
আর্য্যজাতি ও আর্য্যধর্ম্ম	৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯৮, ২২৫, ২৬১
আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা (সমালোচনা)	রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্ন্যাল ...	১৯
আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা (সমালোচনা) (সুবর্ণবণিকসমাচার, মাতৃমন্দির ও বঙ্গলক্ষ্মী হইতে উদ্ধৃত) ২৯—৩০		
আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা (সমালোচনা) শ্রীরত্নমালা দেবী ৬২		
আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা (সমালোচনা) (বঙ্গবাসী হইতে উদ্ধৃত) ১৮৫		
ঈশ্বরকে অন্তরে প্রত্যক্ষ কর	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪
ঈশ্বর ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০১
উৎসবের প্রাণ	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৭৯
উদ্বোধন (১), (২)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৫, ১৩১
উপাস্য কে ?	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬৬
কুরুসিংহাসনের উত্তরাধিকার (১), (২):	শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম-এ, বি-এল ...	৪৩, ৬৬
কুসংস্কারের প্রভাব	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৭৫
কৃতজ্ঞতার অশ্রু (কবিতা)	ডাঃ শ্রীব্রজবল্লভ সাহা এম-এ, পি-এইচ, ডি ...	২৭০
খেয়াল (সমালোচনা)		১০০
গান—(সকলেই গেছে এগিয়ে)	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৫৩

গার্হস্থ্যসংবাদ—

আদ্যশ্রাদ্ধ—অমরকুমার মুখোপাধ্যায়ের, চতুর্থাহ শ্রাদ্ধ—অমরকুমার মুখোপাধ্যায়ের, উপনয়ন—শ্রীসমীন্দ্রকুমার গুপ্তের ৩০ ; নামকরণ ও অন্নপ্রাশন—শ্রীসুহৃৎকুমার গুপ্তের পুত্রের, আনুষ্ঠানিক দান—শ্রীসুশীলকুমার গুপ্তের, উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন—শ্রীসুভগেন্দ্র, শ্রীসিদ্ধীন্দ্র ও শ্রীবাসবেন্দ্রের ৯০ ; নামকরণ ও অন্নপ্রাশন—শ্রীহৃদীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রের ১৫৮ ; আদ্যশ্রাদ্ধ—সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ২০৮ ; চতুর্থাহ ও আদ্যশ্রাদ্ধ—অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ২৭০ ; আদ্যশ্রাদ্ধ—যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ২৭০ ; জন্মদিবস—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ২৭১ ; নামকরণ—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের পুত্রের ২৭০ ; বিবাহ—শ্রীমেধা দেবী-পণ্ডিত শ্রীরাজনাথ ৩০২ ; দীক্ষাগ্রহণ—পণ্ডিত শ্রীরাজনাথের ৩০০ ; নামকরণ—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদারের পুত্রের ৩০০

গ্রন্থপরিচয়— শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিলাতভ্রমণ ২৩ ; প্রকৃতিপরিচয়, বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস (১ম খণ্ড), হোমিওপ্যাথিক নীতিরত্নমালা ৫৮-৫১ ; জাপান পরশ ১২ ; পুজোবাড়ী ১২৮ ; ভগবৎপ্রসঙ্গ ২১৫ ; চুলের গাছ, অমর গল্প, ভাগবতধর্ম্ম, দীপ ও ধূপ (শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ) ৩৩১ ;

গৌতম-বুদ্ধ (পূর্ব্বকথা)	শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ ...	৭
চা-পান, না বিষপান ?	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৪৭

চিত্রসূচী—

স্বামী বিবেকানন্দের জননী ভুবনেশ্বরী, স্যর সুরেন্দ্রনাথের জননী জগদম্বা দেবী, বর্মার সাগর বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জননী সারদা দেবী, সুকবি ও-সি দত্তের জননী রাইকিশোরী, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীর জননী গোলোকমণি দেবী, প্যারীচরণ সরকারের জননী ব্রহ্মময়ী, প্রথম ভারতবর্ষীয় একাউন্টেন্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্যের জননী মন্দাকিনী দেবী, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জননী জগত্তারিণী দেবী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জননী নিস্তারিণী দেবী, (বৈশাখের মুখপত্রে) মহিলাকবি তরুদত্তের জননী ক্ষেত্রমণি, সুকবি বরদাচরণ মিত্রের জননী (নাম অজ্ঞাত), স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জননী সোনামণি দেবী, প্যারীচাঁদ মিত্রের জননী আনন্দময়ী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জননী আনন্দময়ী দেবী, স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের জননী অন্নদাসুন্দরী দেবী, রামগোপাল ঘোষের জননী শ্যামাসুন্দরী, দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, হেমেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র প্রভৃতির জননী সারদা দেবী, কালীপ্রসন্ন সিংহের জননী ত্রৈলোক্যমোহিনী, স্যর আশুতোষ চৌধুরীর জননী মগ্নময়ী দেবী। (জ্যৈষ্ঠের মুখপত্রে)।

ছাত্রজীবন	শ্রীরত্নমালা দেবী ...	২০৮
জয়-পরাজয়	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২২১

বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা

জড়জগৎ ও মানবাত্মায় ভগবানের প্রকাশ — শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ ... ৩৫০
ডাক্তার শ্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সঙ্গীতভারতী শ্রীরাণীদেবীর শুভ বিবাহ ... ৩২৫
উদীচ্যকর্ম্ম ... ৩৩১
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিজ্ঞাপনী—বন্ধু আমার, খেয়াল, আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার সমালোচনা ... ৩০৪
দানপ্রাপ্তি ... ৬১, ১৫৯, ৩৬২
দীক্ষার্থীকে প্রতিজ্ঞাগ্রহণে আহ্বান — শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৩৬
দেবমন্দিরে — শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১০২
দ্রৌপদী কি পাণ্ডবগণের বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী ? — শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম-এ, বি-এল ... ১৭২
দ্রৌপদীর বিবাহ-রহস্য — শ্রীবীরেশ্বর সেন ... ২২৮
নববর্ষে উদ্বোধন — শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৩২
নবপত্রিকাপ্রবেশ — শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ... ১৯৪
নানা কথা— শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমকথা, রামমোহন-স্মৃতিস্তম্ভ, অধঃপাতের পথে, হিন্দুসমাজসম্মিলন ২২-২৩ ; নগ্নমূর্ত্তির বিরুদ্ধে, রুষিয়া নামের উৎপত্তি, নারীনৃত্য, কাপুরুষের অধম, নারীধর্ষণ, ২৫০ বৎসরের বৃদ্ধ চীনাম্যান, রাধাস্বামীসম্প্রদায়ে বিরোধ, প্রতাপ-জয়ন্তী ৫৩-৫৮ ; দীর্ঘায়ু পুরুষ, নারীর পরিচ্ছদ, ইংলণ্ডে সন্ন্যাসিনী, বঙ্গে বরফবার্ত্তা, আসানসোলে পূর্ণিমাসম্মেলন, সঞ্জীবনীর সংসাহ ৯০-৯২ ; অশ্লীল ছবি, ভিক্টর হিউগো ও নাস্তিকতা, দেবদাসীপ্রথারহিত, বন্যা-নিবারণের উপায়, বিলাতের মিল বন্ধ, বস্ত্রের কথা, সহবাসসম্মতি কমিটির রিপোর্ট, নারীধর্ষণ ১২৬-১২৮ ; ভাদ্রোৎসব, খাসমহলের নূতন সেটেলমেণ্ট, উত্তরমেরু শীতল নহে, জাগরণ ১৫৫-১৫৬ ; তরুণসাহিত্য, তরুণের মতিগতি, বাল্যবিবাহ-নিরোধ আইন, পূর্ণিমাবিরহিত মাস, যতীন্দ্রনাথ দাসের আত্মবলি, শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ১৮২-১৮৩ ; ঈশ্বরের আশ্বাসবাণী, বিলাতের পরিচ্ছদ, ইচ্ছা থাকিলেই পথপ্রাপ্তি ২১০ ; দ্রৌপদীর বিবাহ, পর্দ্দার বিরুদ্ধে, দীর্ঘায়ু পুরুষ, দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার, কাফিরিস্থান, ঘোড়দৌড়ে জুয়াখেলা, বায়স্কোপ, ভারতবাসীর দারিদ্র্য, হিন্দুর কর্ত্তব্য, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্ম, অসাম্প্রদায়িক-পত্র 'মেসেজ' ২৩৬-২৪১ ; পর্দ্দা ও মুসলমানসমাজ, অশ্লীল সাহিত্য, নিখিল ভারতীয় বৌদ্ধ মহাসভা, বিলাতের দারিদ্র্য, ইংরাজ-সৈন্য ও বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রী, দীর্ঘজীবী পুরুষ, ফেরিওয়ালা ম্যাজিষ্ট্রেট, নারী-ধর্ষণের প্রতীকার ২৭০-২৭২
নারী-নৃত্য — শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি-এ ... ৪৮
নিবেদন — ৺শিতিকণ্ঠ মল্লিক ... ২৯৬
নিঃস্বার্থ ভালবাসা — শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ ... ১১
নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত — শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্ত সন্ধ্যা এল আকাশ জুড়ে, বীণা তব শুনি মোর পরাণ চাহে, জাগো সবে জাগো আজি পুণ্য দিনে, তব চরণকমলে মম মনভ্রমর ১৬ ; পরাণ ছুটে তোমার পানে, আজি বন উপবন ফুলে, প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী ২৯৭ . (মা) মিলেছি মা তোর মধুর ডাকে, তোর মা রূপে আজ ভরেছে ভুবন, মন ভজরে আনন্দ পরম ধন ২৯৮ ; আজিকে মধুর সুবিমল প্রাতে প্রাণ মোর ধাইছে, (মন) প্রাণ খুলে গাও মায়েরি নাম, প্রাণ মন সঁপিনু তোমার পদে অন্তর্য্যামী, শঙ্কানাশিনী জননী, দেখা দেও— দাও সখা ৩০৫
যেমন করে পারি হরি, প্রভু করুণা কুরু কিঞ্চিত (চিরঞ্জীব শর্ম্মা) ১৫৫ ; অসতো মা সদ্গময় (শ্রীরাণী দেবী).
পণ্ডিত ভুবনমোহন কর — শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল ... ৯৪
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী — শ্রীললিতমোহন দাস এম-এ ... ১০৬
পত্র (কুরুবংশের দায়াধিকার সম্বন্ধে) — ব্যারিষ্টার শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১৮৪
পত্রিকাপরিচয়—
প্রকৃতি, সঞ্জীবনী, ব্রহ্মবিদ্যা, Navavidhan, ধর্ম্মতত্ত্ব ২০-২৬ ; হিন্দু, বঙ্গবাণী, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ, বিচিত্রা ১২৭ ; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, Industry, গৃহস্থমঙ্গল, মানসী ও মর্ম্মবাণী ২১১ ; শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, সৌরভ, মাতৃমন্দির, হোমিওপ্যাথিক পরিচারক ২১২ ; জন্মভূমি, ভারতবর্ষ ২১৪ ; অর্চ্চনা, The Message ২১৫ ; গৃহস্থমঙ্গল, ব্যবসা ও বাণিজ্য, হোমিওপ্যাথিক পরিচারক, ধর্ম্মতত্ত্ব ২৪৩-২৪৫ ; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, যুবক, বঙ্গলক্ষ্মী ২৬২ ।
পথের সন্ধান — শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ ... ২৯৩
পারশিক শিল্প — ডাঃ শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য্য আই-ই-এস, এম-এ, পি-এইচ. ডি, ডি-লিট ... ২৫৪
পুরুষতর্পণ — শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৩১৭
প্রকৃতির উপর রাগরাগিণীর প্রভাবের সমালোচনা ... ৩২
প্রচারক্ষেত্র — শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ ... ২৬৪
প্রতিভার জন্মরহস্য — রায়বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ এম-এ বি-এল, বিদ্যার্ণব ... ৭৯
প্রতিবাদ (কুরুসিংহাসনের উত্তরাধিকার বিষয়ে) — শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্ সি ... ৮৯
প্রতিবাদের প্রতিবাদ (কুরুসিংহাসনের উত্তরাধিকার বিষয়ে) — শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম-এ, বি-এল ... ১২৪
প্রাণদণ্ড রহিত হওয়া উচিত — শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ২২৯
বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত — শ্রীমনমোহন চক্রবর্ত্তী ... ১৭৬
বর্ষশেষে উদ্বোধন — শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৩
বাঙ্গালী কবি ও বিদেশী সমালোচক (রামশর্ম্মা ও দত্তকবি) (১),(২)(৩) — শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ বি-এল ২৬৬, ৩২২, ৩৫১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বাঙ্গলা সাহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দান	শ্রীনিরঞ্জন সরকার	৩১১
বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন		২৬৯
বিবাহে পণপ্রথা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৮৬
বিভূগুণ গাও (গান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৬১
বুদ্ধের আবির্ভাব	শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ ...	৮২
বুদ্ধের গৃহত্যাগ	শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ ...	১৫৩
বুদ্ধের ভাবপরিবর্তন	শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ ...	২২১
বেদগান (অসতো মা সদ্গময়) (স্বরলিপি-সহ)	ডাঃ শ্রীবাণী দেবী ...	৩২০
বৈয়াসিক ন্যায়মালা (চতুর্থ, পঞ্চম অধিকরণ)	শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি ...	১১৫
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি—	(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) শ্রীবাণী দেবী	
ওঁ পিতা তুমি ১৫ ; সুন্দর প্রকাশ হে ৫৩ ; কোয়েলা কুহরে রে ৭৭ ; তব পদে লভি চিতে ৭৮ ; তোমা হারাইয়া প্রাণ ৭৮ ; থরে থরে ফুটিল রে, কোলে লহ জননী হে ১২০ ; মন ভজ রে আনন্দ পরম ধন ১৪২ ; জাগো সবে জাগো আজি পুণ্য দিনে ১৪৪ ; দিলে না তো নিলে না প্রেম ২০১ ;		
প্রভু করুণা কুরু কিঞ্চিত ২০৪ ।	(চিরঞ্জীব শর্ম্মা) শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস	
ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ ...	৮৭
ব্রহ্মোপাসনা ও স্বাধীনতা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৬২
ব্রাহ্মধর্ম্মের দান	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৩৯
ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্মকথা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৩
ব্রাহ্মসমাজের পতনের কারণ	শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১২১
ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহ	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৩২
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তাহার প্রচ্ছন্ন প্রভাব	শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় ...	৩৩৬
ব্রাহ্মসমাজে অবসাদ কেন ?	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ...	১৬৪
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার	সদানন্দ শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ...	২৬৯
ব্রাহ্মসমাজের পুরাতনী [রাজা রামমোহন রায়]	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ...	১৭১
ব্রাহ্মসমাজের দান	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৯৩
ব্রাহ্মসমাজ ও শাস্ত্র	শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ ...	৩০৯
ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপকরণ (১), (২), (৩), (৪)		৬, ৫১, ১১৮, ১৫
ভাব সেই একে	৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ...	১৮
ভারতীয় সাধনামূলক শিক্ষা	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ...	৫
ভূমিদান (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার শাস্ত্রী কর্ত্তৃক)		৩৬
ভ্রমসংশোধন		২৭ ; ৬১ ; ৯৩ ; ১০
মনুষ্যত্বের বিকাশে প্রকৃত শিক্ষা (১), (২)	শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত বি-এল ...	১৭, ১৪
মহদ্বাণী	(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগ্রহ) ...	১৮১
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও স্বাধীনতাপ্রীতি	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৮২
মহাত্মা গান্ধীর অভিযান	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৩৫
মহাভারতের প্রক্ষিপ্তবাদ	শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম-এ বি-এল ...	২২
মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স দ্বারকানাথ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, কবিভূষণ কাব্যরত্ন বি-এ	৩৫৩
মাঘোৎসবে উদ্বোধন (৫ই মাঘ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০৫
মাঘোৎসবে উদ্বোধন (১লা মাঘ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২১৫
মাঘের উদ্বোধন—১১ই	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৯১
মাতৃমঙ্গল—	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৭ ; ২১৭ ; ২৪৯ ; ৩৩৯
ক্ষমাপ্রার্থনা, ফিরে আসা, পথের ধারে, দায়ী কে, মা—মা, আবার কবে, নিবেদন, ক্ষমাপ্রার্থী, চরণস্পর্শ চাই, ধ্রুবতারা, সংসার-শ্মশানে, দর্পচূর্ণ, জীর্ণতরী, শেষ দিনে, শেষ মুহূর্ত্তে, কোলে লও		
ম্যানচেষ্টার কলেজ এবং মীডভিল থিয়লজিক্যাল স্কুলের কলার্শিপ সম্বন্ধে পত্র	...	২০৭
ম্যানচেষ্টার কলেজ এবং মীডভিল থিওলজিকাল স্কুলের স্কলার্শিপ সম্বন্ধে পত্রের অনুবাদ	শ্রীঅমিয়চন্দ্র ব্যানার্জ্জি আই-ই-এস, এম-এ (ক্যানটাব), এম্-এস্-সি [কলিকাতা], এফ্-আর-এস্ [লণ্ডন]	২৪৬
মিলনোৎসবে	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৮৫
মোহ (কবিতা)	শ্রীহরিপদ দাস ...	৭৩
রসায়ন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরিভাষা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১১২

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
রংপুরে রামমোহন রায় (১), (২)	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৭৪, ১০৬
রাজকুমার হেমসন্তর	শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ	...	৪৫
রাজা রামমোহন রায় ও অপবাদখণ্ডন	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৭৭
রাজা রামমোহন রায়	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৬৭
রামায়ণ সম্বন্ধে দুই-একটী কথা	শ্রীবীরেশ্বর সেন	...	৩৫২
রামগীতার বিবাহ ও বৌদ্ধশাস্ত্র	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩৫৪
রুষিয়া ও উড়িষ্যা	শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম-এ বি-এল	...	২০৬
লর্ড আরউইনের ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে মন্তব্য	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ বার-অ্যাট-ল	...	২৪১
লহ প্রভু (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩২৪
শততম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব		...	২৯৮
শিশুদের সঙ্গীত শিক্ষার প্রয়োজন	শ্রীবাণী দেবী	...	১৫৫

শোকসংবাদ—

বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, রুক্মিণী দেবী, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭; অমরকুমার মুখোপাধ্যায় ৬০; গগনচন্দ্র হোম ১২৮; অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী ১৫৮; জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১৮৪; সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী ২১৬; অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত শঙ্করনাথ ২৪৮; যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবকুমার রায় চৌধুরী ২৭০; শিতিকণ্ঠ মল্লিক; ৩০০; অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৩৩৭;

সত্য না কল্পনা?	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ,	...	৩৯
সঙ্গীত-স্বরলিপির মর্য্যাদা	শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস	...	১৩০
সুখদাসুন্দরী অমৃতধামে		...	৩৬২
সুভাষিত-সংগ্রহ	ডাঃ শ্রীব্রজবল্লভ সাহা এম-এ, পি-এইচ্‌ ডি	...	১২৯
সুধীন্দ্রনাথের পরলোকগমনে	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৪৫
সঙ্ঘের অঙ্কুরোদ্গম	শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ	...	২২২
সঙ্ঘের প্রসার (১), (২)	শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ	...	৩১৩, ৩৪১

সংবাদ—

চিত্রকথা, অনাথ ব্রাহ্মপরিবার-সংস্থান ধনভাণ্ডার, সপত্নীক শ্রীযোগানন্দ সিংহের দীক্ষাগ্রহণ ২৭; প্রবর্ত্তকসঙ্ঘে সাহিত্যসভা, রাজদ্রোহে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সাপ্তাহিক উপাসনা, উপনিষৎপাঠ, মেডিকেল মিশন, বুদ্ধাষ্টমী, চিত্রকথা ৬০—৬১; ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব, পুণ্যাহ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, উপনিষৎপাঠ, মেডিকেল মিশন ১০; ভাদ্রোৎসব ১৫৮; রাজা রামমোহন রায় স্মৃতিসভা, শিবনাথ শাস্ত্রী ১৫৮; শ্রীমতী বাণী দেবীর উপাধিলাভ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাদিবস, উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজ, নিখিল ভারতীয় বৌদ্ধ-সম্মিলন, মহাজনদিবস ২৭০—২৭৪, স্মৃতিসভা—৺শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয়ের, অভিনন্দন, মাঘোৎসবে শান্তিবাচন ৩০৬,

স্মৃতিতর্পণ	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	...	১৭৯
হবিঃ (সমালোচনা) সঞ্জীবনী হইতে			৩০৬
হুগলী বয়কাভাঙ্গার মাঠ	কুমার শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়	...	১২৪
Invocation	Sadananda Sj Kali prasanna Biswas		২৮৮
Lord Buddha's Message of World Peace	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪১
Message to Young India	Sadananda sj Kali prasanna Biswas		২৮৯
The All-India Theistic Conference এর আহ্বান-পত্র		...	২৪৭
The Message of Buddeist India	Dharma Aditya Dharmacharyya		২৩১, ২৫৯



স্বামী বিবেকানন্দের
জননী—ভুবনেশ্বরী



স্যর সুরেন্দ্রনাথের
জননী—জগদম্বা দেবী



দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের জননী
ভগবতী দেবী

ব্রহ্মানন্দ;
কেশব সেনের জননী
সারদা দেবী



সুকবি ও সি দত্তের
জননী—রাইকিশোরী





আচার্য্য শিবনাথ
শাস্ত্রীর জননী
গোলোকমণি দেবী



প্যারীচরণ
সরকারের জননী
দ্রবময়ী



স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জননী
জগত্তারিণী দেবী



প্রথম ভারতবর্ষীয়
একাউণ্টেণ্ট জেনা-
রেল মন্মথনাথ
ভট্টাচার্য্যের জননী
মন্দাকিনী দেবী



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন
দাশের জননী
নিস্তারিণী দেবী

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা ১০২৯ | ১৮৫১ শক বৈশাখ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯২৯। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অঞ্জলি—বিজয়দাতা দেবতা।

১। হে ভগবান! তোমার আদেশে কৃষ্ণবর্ণ অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া জলদাতা মেঘসকল ছুটিয়া আসিতেছে। তুমি সেই রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছ। তোমার কণ্ঠহারের বিদ্যুজ্জ্যোতি থাকিয়া থাকিয়া নরনারীর নয়ন ঝলসাইয়া দিতেছে। তোমার মঙ্গলশংখের বজ্রনিনাদে জগতবাসী আশ্বস্ত হইতেছে। তাহারা নানাকর্ম্মের আয়োজন করিতেছে। তোমার করুণাবারিতে ধরণী ভাসাইয়া দাও।

২। আমরা রৌপ্যসদৃশ উজ্জ্বল ও কঠিন অয়স্কান্তনির্ম্মিত যন্ত্র দ্বারা ভূমি খনন করিয়া রাখিয়াছি। তুমি এখন তোমার করুণাবারি দ্বারা সেই ভূমিকে সিক্ত করিয়া প্রচুর অন্ন উৎপাদনের উপযুক্ত কর, যাহাতে আমরা সেই অন্ন দ্বারা যথাযুক্ত বল লাভ করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে বিজয়লাভ করিতে পারি।

৩। আমাদের ধনরত্ন অপহরণের জন্য শত্রুগণ কত না উপায় অবলম্বন করিতেছে। তুমি আমাদের কর্ম্মরথের সারথি আছ বলিয়া তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে প্রবল সেনাদল প্রেরণ করিয়াও আমাদের সুদৃঢ় গৃহ ভেদ করিতে পারিতেছে না। আমাদের স্বপক্ষ সেনাদল যথানিয়মে কার্য্য করিয়া তোমারই বিজয় ঘোষণা করিতেছে।

৪। আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, আমাদের দুঃখ অবসানের সময় আগতপ্রায়। তোমার করুণাবারি আমাদের কর্ম্মযজ্ঞের সাফল্য প্রদান করিতেছে। তোমারই নামের বিজয় ঘোষণার জন্য এবং জগতবাসীর হিতের নিমিত্ত আমরা নানাস্থানে কূপতড়াগাদি খনন করিয়া দিতেছি।

৫। আমাদের গৃহসকল ধনরত্নে পূর্ণ হৌক। আমাদের পশুশালাসকল গো অশ্বে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকুক। আমাদের যানবাহনাদির যেন কখনই অভাব না হয়। যে প্রকার স্তবের সাহায্যে পূর্ব্বতন ঋষিরা তাঁহাদের দেহে মনে ও আত্মাতে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, আমরাও তোমার চরণে সেই প্রকার স্তবস্তুতির পুষ্পপাত্র নিবেদন করিতেছি। তুমি প্রেমভরে আমাদের এই পূজা গ্রহণ কর।

৬। তোমার অনন্ত মহিমা। আমাদের স্তব স্তুতি তোমার সেই মহিমাসাগরের কূল স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু হে বন্ধু!

তুমি কৃপা করিয়া আমাদের ক্ষীণকণ্ঠের অর্দ্ধস্ফুট স্তবস্তুতির নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া আমাদের রিক্ত হৃদয়কে পূর্ণ করিবে জানি। তাই তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া এই নৈবেদ্য হস্তে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি তাহা গ্রহণ কর। তুমি আমাদের স্তবস্তুতি শ্রবণ কর। আমাদের দেহ সুন্দর হৌক, মন সুপ্রসন্ন হৌক, আত্মা সমুন্নত হৌক।

অঞ্জলি—কল্যাণকর দেবতা।

১। হে ভগবান! তুমি কল্যাণকর। তুমি আমাদের অন্তরে অবস্থিতি করিয়া নিয়ত শুভবুদ্ধি প্রদান কর। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না, আমাদিগকে বিনাশ করিও না। আমাদের শুভ কর্ম্মযজ্ঞে শত্রুগণ যে সকল বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে, তুমি সে সমস্ত বিঘ্ন তোমার মঙ্গল হস্তে অপসারিত কর এবং আমাদিগকে জ্ঞানে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে সমুন্নত কর।

২। আমাদের হৃদয় হইতে অপরের প্রতি দ্বেষহিংসা চলিয়া যাউক। দেব-নর-যক্ষ-রক্ষ সকলেই আমাদের কর্ম্মযজ্ঞে সহায় হৌক। আমাদের উপর সকলেরই শুভ ইচ্ছা ও মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। সর্ব্বোপরি, তুমি আমাদের চিরবন্ধু ও চিরনির্ভরস্থল হইয়া থাক। তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা যেন প্রতি মুহূর্ত্তে নিত্য নব জীবন লাভ করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হই।

৩। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিমুনিদিগের আহ্বানে তুমি সাড়া দিয়াছিলে। আমরাও তাই তাঁহাদের পদানুসরণে তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি সাড়া দিয়া আমাদিগের ব্যাকুলতা দূর কর। আমাদের কর্ম্মযজ্ঞে তোমাকে সমাসীন দেখিলে সকল দেবতা এখানে উপস্থিত হইয়া আমাদের কর্ম্মে সহায়তা করিবেন। বায়ুসকল মধু বহন করিবে, নদনদীর জল সুমিষ্ট হইবে এবং গাভীসকল মধু ক্ষরণ করিবে।

৪। সুমঙ্গল বায়ু রোগবীজসকল নষ্ট করিয়া আমাদের দেহে বলাধান করুক। সকলের আধার এই ধরিত্রী বীর্য্যপূর্ণ শস্যসকল উৎপাদন করিয়া আমাদিগকে বীর্য্যবান করুক। চন্দ্রসূর্য্য আমাদিগের বল বিধান করুক। পূর্ব্বপশ্চিমবাহিনী নদীসকল ধরণীপৃষ্ঠকে বিধৌত করিয়া প্রচুর শস্যের আধার করিয়া তুলুক। তুমি আমাদের এই সকল প্রার্থনা সফল কর।

৫। তুমি সকল দেবতার পরম দেবতা, সকল প্রভুর পরম প্রভু। তুমিই বিশ্বজগতের একমাত্র অধিপতি। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে আহ্বান করি। তুমি আমাদের কর্ম্মযজ্ঞে উপস্থিত হও এবং আমাদিগকে রক্ষা কর।

৬। তোমার আদেশে সূর্য্যের অর্করূপ জগতের রোগবীজ বিনষ্ট করিয়া তোমার রোগহর মূর্ত্তি প্রকাশ করুক। সূর্য্যের পূষারূপ জগতের পুষ্টিবিধান করিয়া আমাদের সম্মুখে তোমার পুষ্টিদাতা মূর্ত্তি প্রকাশ করুক। তুমিই আমাদের মঙ্গলবিধাতা। তুমিই আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তুমি জ্ঞানদাতা। আমরা তোমাকে ভজনা করি, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

৭। তোমার আদেশে পূর্ব্বদিক হইতে বিন্দুচিহ্নিত মৃগবাহিত রথে বায়ু আসিয়া তোমারই করুণা-করুণ আচ্ছাদনে গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত করে। জগতবাসী যখন গ্রীষ্মকালে অগ্নিস্নিগ্ধ সূর্য্যের খরতাপে দগ্ধ হইয়া বারিবিন্দুর জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে উন্মুখ হইয়া থাকে, তখন সেই পূর্ব্ববায়ুবাহিত মেঘ হইতে বারিধারা নামিয়া তোমারই করুণা সুব্যক্ত করে। আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

৮। তুমি আমাদের কল্যাণকর। তোমার কল্যাণবাণী আমাদের কর্ণে দিবানিশি ধ্বনিত হৌক। তোমার মঙ্গলমূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হউক। আমাদিগকে শতবর্ষ পরমায়ু দাও এবং আমাদের শরীরকে সবল ও সতেজ কর, যাহাতে আমরা তোমার মঙ্গল নাম গৃহে গৃহে প্রচার করিতে সক্ষম হই।

৯। আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই আমরা যেন আমাদের পুত্রপৌত্রাদির অন্তরে তোমার মঙ্গলমূর্ত্তি খোদিত করিয়া দিতে পারি। তাহারাও যেন তাহাদের সকল কর্ম্মে সর্ব্বাগ্রে তোমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করে ও তোমাকেই অর্চ্চনা করে।

১০। এই অসীম আকাশে তোমারই মঙ্গলহস্ত প্রকাশ পাইতেছে। শতকোটী সূর্য্যচন্দ্র-গ্রহ

নক্ষত্রখচিত এই দ্যুলোকে তোমারই মঙ্গলহস্ত প্রকাশ পাইতেছে। মাতার ন্যায় তুমি এই ত্রিভুবন পালন করিতেছ। পিতার ন্যায় তুমিই সকলের অন্তরে জ্ঞান বিতরণ করিতেছ। আমরা তোমার সন্তান—তোমার স্নেহপ্রেম আমাদের উপর দিবানিশি অজস্রধারে ঝরিতেছে। তুমিই আমাদের একমাত্র বরণীয় পরম দেবতা। আমরা যেন তোমাকে ছাড়িয়া তোমার প্রতীকসমূহের চরণে মস্তক অবনত না করি। আমাদের মন ও আত্মাকে তোমার অভিমুখে সমুন্নত কর।

বর্ষশেষে উদ্বোধন। *

জীবনের একটী বৎসর কাটিয়া গেল। সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার মধ্য দিয়া একটী বৎসর কাটিয়া গেল। এই একটী বৎসরের ভিতর কত ভুলভ্রান্তি করিয়াছি, তাহার কোনই হিসাব রাখি নাই। দুঃখ-শোকের কত কঠিন আঘাত পাইয়াছি, তাহার কোনই হিসাব রাখি নাই। আশানিরাশার কত দ্বন্দ্ব জীবনকে নিষ্পিষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, তাহারও কোন হিসাব রাখি নাই। অন্য দিকে, গত বৎসর সংসারযাত্রার পথে কত সুখশান্তি লাভ করিয়াছি, প্রাণের উপর দিয়া আনন্দের কত তরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে, তাহারও কোন হিসাব রাখি নাই। কিন্তু অতীত সুখের বিষয় স্মরণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইবার জন্য প্রাণ আজ অগ্রসর হইতেছে না; অতীত আশা আনন্দের প্রতিধ্বনি আজ আমাদের হৃদয়-মনকে জাগাইয়া তুলিতে পারিতেছে না। বরঞ্চ যে সকল ভুলভ্রান্তি করিয়াছি, ঈশ্বরের সুস্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে যে সকল কার্য্য করিয়াছি, সেই সমস্তের আঘাতে প্রাণ যেন বিকল হইয়া উঠিতেছে; জীবনটাকে যেন ব্যর্থতার ঘন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; প্রাণে যেন পূর্ব্বের ন্যায় আর সে উৎসাহ, উদ্যম, তেজ কিছুই আসিতে চাহে না। মনে হয়, জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে বিজয়লাভ করিবার শক্তিসামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছি। মনে হয়, আগামী বৎসরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া জীবনব্যাপী অজ্ঞাতবাসের আশ্রয় গ্রহণ করি।

কিন্তু অজ্ঞাতবাসে তোমাকে যাইতে দেবে কে? তুমি মনে করিয়াছ যে, অন্নবস্ত্র প্রভৃতি তোমার যাহা কিছু আবশ্যক, সে সমস্ত সংগ্রহ করিবে সংসারের নিকটে; কিন্তু সংসারের কর্ম্মসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া তাহার দুঃখকষ্টের ভাগ গ্রহণ করিবে না। ভগবানের বিধান তাহা নহে। তাঁহার কর্ম্মচক্র তোমাকে কর্ম্ম-সংগ্রামে অবতীর্ণ করাইবেই এবং জগতবাসীর সঙ্গে তোমাকেও জগতের দুঃখকষ্টের অংশগ্রহণে বাধ্য করিবে। সুখসম্পদের উত্তাপে এবং দুঃখশোকের শান্তিধারা লাভ করিয়া মঙ্গল-অমঙ্গলের ভিতর দিয়া জগতের চির-উন্নতি, চির-মঙ্গল ও চির আনন্দের পথে অগ্রসর হওয়াই ভগবানের অভিপ্রেত। কেন তাহা জানি না; কিন্তু প্রত্যক্ষ করি যে, যন্ত্রী ভগবান মানুষকেই সেই উন্নতিসাধনের প্রধান যন্ত্র করিয়াছেন। তাঁহার হাতের যন্ত্র হইবার অধিকার লাভ করিয়াছি বলিয়াই তো মানবের এত গৌরব। আমরাও যেমন ব্যাকুলপ্রাণে তাঁহাকে আমাদের হৃদয়ে জননীমূর্ত্তিতে, সখাসুহৃৎরূপে বসিবার জন্য আহ্বান করি, তাঁহারও তেমনি মানুষে প্রয়োজন আছে—বিশ্বপতি ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের সহায়তা আবশ্যক, ইহাই তো আমাদের গৌরবপূর্ণ অধিকার। মানুষ ব্যতীত তাঁহার পবিত্র নামের বিজয়বার্ত্তা কে কত দিকে দিকে বহন করিয়াছে? মানুষ ব্যতীত তাঁহার মঙ্গল দৃষ্টিতে দৃষ্টি রাখিয়া অসাধুতার বিনাশসাধনে কে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? পাপতাপে দগ্ধপ্রাণ মানবের অন্তরে ভগবানের যন্ত্রস্বরূপে মানুষ ব্যতীত কে কত শান্তিবারি প্রদান করিতে দক্ষিণহস্ত বাড়াইয়া দিয়াছে?

জগতের উন্নতিসাধনে, মানবের মঙ্গলসাধনে যে মানুষ ভগবানের যন্ত্র হইতে পারে এবং তাঁহার সহায়তা করিবার গৌরব ধারণ করে, সে মানুষ আকারে সাড়ে তিন হাত পরিমিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র নহে। ভগবানের যন্ত্রস্বরূপে কার্য্য করিয়া চলিবার পথে, জগতের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতিসাধনে অগ্রসর হইবার পথে আমাদের নানা বিষয়ে ভুলভ্রান্তি হইলেও আমাদের সে মহত্ত্ব কেহই বিনষ্ট করিতে পারে না, আমাদের সে গৌরবপূর্ণ অধিকার বিলুপ্ত করিতে পারে না। আমরা অপূর্ণ-সীমাবদ্ধ হইয়া যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন ভুলভ্রান্তি তো হইবেই; মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধানেই দুঃখকষ্ট নিরাশানিরানন্দের ভিতর দিয়াই মুক্তির পথে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে—ছায়াবহুল বটবৃক্ষের মূল, প্রস্তর বিদীর্ণ করিতে গিয়াই দৃঢ়তা লাভ করে।

অতীতে ভুলভ্রান্তি করিয়াছ বলিয়া হাহুতাশ করিবার কোনই কারণ নাই; অতীতে তোমার কর্ম্মদোষে, সঙ্গদোষে, উপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনার অভাবে নিরাশানিরানন্দ যাহা কিছু নিজের প্রাণে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলে, আজ বৎসরের এই শেষ দিনে সে সমস্তই ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে; ভুলভ্রান্তির জন্য হাহুতাশ করা দূরে

* ৯৯তম ব্রাহ্মসম্বতের বর্ষশেষ ব্রহ্মোপাসনা উপলক্ষে ৩০ চৈত্র আদিব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিবৃত।

করিয়া দাও; জগতের এক কোণে বসিয়া নিরাশানিরানন্দের তপ্তনিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই। জননীর স্নেহের আহ্বান কানে আসিয়া পৌছিয়াছে। পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না। পবিত্রতার নববস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনের দ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত হও। নব উৎসাহে নব উদ্যমে পুণ্যের পথে অগ্রসর হও—জননী স্বয়ং নিজহস্তে তোমার সমস্ত ভুলভ্রান্তি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবেন, শান্তিধারা অজস্র বর্ষণ করিয়া তোমার প্রাণের সকল জ্বালা সকল যন্ত্রণা নির্ব্বাপিত করিয়া দিবেন। চক্ষু খুলিয়া দেখ, তাঁহার মঙ্গলদৃষ্টি নিত্য জাগ্রত থাকিয়া শত অমঙ্গলের ভিতরেও নিত্য মঙ্গলের উৎস খুলিয়া রাখিয়াছে।

তিনি আমাদের বন্ধু। তাঁহার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতম যোগ। তিনিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না; আমরাও তাঁহাকে ইচ্ছা করিলেও পরিত্যাগ করিতে পারি না। আজ নববর্ষের মুখে পুরাতন বৎসরের অতীত কথা, ভুলভ্রান্তির কথা দূরে ফেলিয়া জীবনলাভের পথে অগ্রসর হও। ভবিষ্যতেরও আশা যতই আনন্দদায়ক হোক, তাহার মোহে মুগ্ধ হইও না। একমাত্র ভগবানকে পিতামাতা জানিয়া তাঁহারই আদেশ শুনিয়া চল—সুখদুঃখ, বিপদসম্পদ, যাহা কিছু পাইবে, তাহারই মধ্যে তাঁহার মঙ্গলহস্ত খুঁজিয়া বাহির কর, নববলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে; হৃদয়ে নবতর আনন্দের আনন্দের উৎস খুলিয়া যাইবে, ভয়ভাবনা অন্তর্হিত হইবে। অতীতের ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া মানুষের উপযুক্ত মহত্ত্ব লাভ কর। যে সত্যের বলে বিশ্বজগত সুশাসিত হইয়া চলিতেছে, যে সত্যের বলে বিশ্বমানব ধর্ম্মের পথে, জ্ঞানের পথে ও কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, সেই সত্যের দিকে আত্মার দৃষ্টিকে স্থিরতর রাখিও। সংসারের ভয়ে তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে পশ্চাৎপদ হইও না। তিনিই সকল ভয়ের ভয়, তিনিই তোমার নিত্য সঙ্গী। সকল প্রকার ভয়কে পদদলিত করিয়া নির্ভয় হও; সর্ব্ববিধ দীনতা, সর্ব্ববিধ সংশয়কে পদদলিত করিয়া সকল দেবতার পরম দেবতা, জীবনের প্রভু সেই সত্যস্বরূপ ভগবানকে উপলব্ধি কর এবং অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়া নূতন জন্মলাভ কর; সকল স্বার্থ তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া তোমার যোগক্ষেমের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া সেই অমৃতপুরুষের কার্য্যে আপনাকে চিরনিযুক্ত করিয়া দাও এবং অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়া নূতন জন্ম লাভ কর, এবং অমর হইয়া যাও।

ঈশ্বরকে অন্তরে প্রত্যক্ষ কর। *

বাহিরের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখিলে আমরা অন্তরের বিষয় ভালরূপ জানিতে পারি না, দেখিতে পাই না। আমাদের মন চারিদিকে এতই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, এদিকে ওদিকে এতই ছুটাছুটি করে; বাহিরের কোলাহলকলরবের সঙ্গে এতই তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে যে, আমরা বুঝিতেই পারি না যে, আমাদের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে শান্তস্বরূপ চির অধিষ্ঠিত আছেন, যাঁহার মধুময় ইঙ্গিতে শত দুঃখশোক বিপদআপদের মধ্যেও শান্তি আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করে।

কিন্তু ভগবানেরও আবার এমনই মঙ্গল বিধান যে, সেই বিধানের বলেই আমরা চিরকাল বাহিরের দিকে চাহিয়া আনন্দও লাভ করিতে পারি না, সুখশান্তিও খুঁজিয়া পাই না। সময়ে সময়ে এমন ঘটনা আসিয়া পড়ে, যাহা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাদিগকে হৃদয়ের অন্তঃপুরে টানিয়া লইয়া যায়। অন্তঃপুরে গিয়া আমরা শান্তস্বরূপের মধুর গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই এবং তাঁহার চরণে আমাদের মস্তক স্বতই অবনত হয়। তখন আমাদের জ্ঞান প্রসারিত হয়। তখন আমরা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি যে "স সর্ব্বজ্ঞঃ" তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি প্রত্যেক জীবের কি শারীরিক ক্রিয়া, কি মনের চিন্তা, কি আত্মার গতি সকলই জানিতেছেন। তখন বুঝিতে পারি—"স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়"—তিনি বিনাশ হইতে রক্ষা সাধনের জন্য সেতুস্বরূপ হইয়া এই লোকসকলকে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি বাহির হইতে অর্জ্জন করিতে হয় না। তাঁহার জ্ঞানবলক্রিয়া স্বাভাবিক। তাঁহারই জ্ঞানের কণ মাত্র লাভ করিয়া জগতবাসী জ্ঞানের শতবিধ পরিচয় দিতেছে। তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান হওয়াতেই সূর্য্যচন্দ্র হইতে মানব পর্য্যন্ত সকলেরই মধ্যে আমরা শক্তির কত শত আকারে প্রকারে বিকাশ এবং কত আশ্চর্য্য রকমের খেলাই না প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁহাকে ছাড়িয়া জগতের কার্য্যসকল আলোচনা কর, যুক্তি তোমাকে শূন্যের কোটায় লইয়া যাইবে; তাঁহাকে কেন্দ্রে রাখিয়া সকল বিষয় আলোচনা কর, সকলই তোমাকে পূর্ণের অভিমুখে লইয়া যাইবে।

তাঁহার মঙ্গলদৃষ্টি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র প্রসারিত আছে। তিনি আমাদের স্নেহময়ী প্রেমময়ী জননী। তাঁহার নিকট কোনও নরনারীই ত্যাজ্য নহে। পক্ষী যেমন নিজ পক্ষপুটের তলে শাবকগণকে সর্ব্বদাই স্বীয় আশ্রয় দিয়া

* ৯৯ ব্রাহ্মসম্বৎ বর্ষশেষ সান্ধ্য উপাসনায় আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে বিবৃত

রক্ষা করে, তিনিও সেইরূপ পাপীতাপী সাধু অসাধু-নির্ব্বিশেষে সকলকেই স্বীয় মঙ্গলচ্ছায়ার তলে আশ্রয় দিয়া সকল অবস্থাতেই রক্ষা করেন। তিনি আমাদের হইতে দূরে এই বহিরাকাশেও আছেন; তিনি আমাদের নিকট হইতেও নিকটে আত্মার অন্তরতম প্রদেশেও অবস্থিত আছেন। এই বিশ্বজগতের যতটুকু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহা, এবং তাহার যে বিরাটবিশাল অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহা দৃষ্টির অতীত তাহা, সমস্তই তাঁহার মঙ্গলরাজ্য। তুমি শুভ চিন্তা কর, তাহাও যেমন তাঁহার দৃষ্টির অতীত নয়, সেইরূপ তুমি পাপচিন্তা কর, পাপ আচরণ কর, তাহাও তাঁহার দৃষ্টির অতীত নয়। পাপ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে লুকাইবার বৃথা চেষ্টা করিও না। বিশ্বজগতে এমন একবিন্দু স্থান নাই, যেখানে তুমি তাঁহার চক্ষু এড়াইয়া লুকাইতে পারিবে। সমস্ত বিশ্বজগতে, বিশ্বজগতের প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁহার অনিমেষ মঙ্গলদৃষ্টি প্রসারিত। পাপ যদি করিয়াই থাক, তবে তাঁহার নিকট হইতে ভয়ে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিও না। তিনি জননী। তাঁহার নিকটে নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের পাপতাপ সমস্ত নিবেদন করিয়া দাও এবং পাপ চিন্তা ও পাপ আচরণ অতিক্রম করিবার বল ভিক্ষা কর। অনুতাপের অনলে আপনাকে দগ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ কর। সেই শোধিত চিত্তকে তিনি এমন সবল করিবেন যে, তুমি নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে—তাঁহার সেই কৃপা স্মরণ করিয়া তুমি নিজেই অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইবে।

তিনিই আমাদের নেতা, তিনিই আমাদের পুরোহিত। ভয় নাই—ভয় নাই—তিনি আমাদিগকে নিমেষে নিমেষে অভয়দান করিতেছেন। তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনি কদাপি ভয়প্রাপ্ত হন না। তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনি কাহা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না। ভুলভ্রান্তি যাহা কিছু করিয়াছ, তাহার জন্য হাহুতাশ করিয়া সময় নষ্ট করিও না। ভুলভ্রান্তি তুমি যাহা কিছু করিবে, নিশ্চয়ই জানিও যে, সেই অভয়দাতা পরমপুরুষ তোমার সমস্ত ভুলভ্রান্তিও এক অপূর্ব্ব মঙ্গলসূত্রে গ্রথিত করিয়া দিবেন। অন্তরের দ্বন্দ্ববিবাদ, সমস্তই বিদূরিত কর। তাঁহার চরণে সমস্ত নিবেদন করিয়া দাও। সমস্ত দ্বেষহিংসা দ্বন্দ্ববিবাদকে পদতলে নিক্ষেপ করিয়া সকল দ্বন্দ্ববিবাদের অতীত পরম পুরুষকে হৃদয়ে ধারণ কর এবং শান্তিসমুদ্রে অবগাহন কর।

ধ্রুব পর্ব্বতসকল যখন জন্মগ্রহণ করে নাই, তখনও যিনি ছিলেন; জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহার ইচ্ছাতে পর্ব্বতসকল শক্তিলাভ করিয়া সমুন্নত মস্তকে গগন ভেদ করিতে সমুদ্যত; যাঁহার আদেশে পর্ব্বতসকল স্বীয় জীবনের বিনিময়েও শত শত নির্ঝরিণীর সাহায্যে স্তন্যদান করিয়া কত যুগযুগান্তর ধরিয়া কোটী কোটী প্রাণীর জীবন সংরক্ষণের বিধান করিতেছে; যিনি অনন্ত, তিনিই ঈশ্বর।

সকলের আধার এই পৃথিবী যখন জন্মগ্রহণ করে নাই তখনও যিনি ছিলেন; জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহার ইচ্ছাতে কোটী কোটী ফুল্লকুসুমের বিচিত্র শোভাগন্ধে এই পৃথিবী নিত্য প্রফুল্লিত হইয়া উঠিতেছে এবং কোটী কোটী জীবজন্তুর আনন্দধ্বনিতে নিত্য মুখরিত হইয়া উঠিতেছে; এই পৃথিবীর শতবিধ ওষধিবনস্পতির ভিতর দিয়া যাঁহার অনুপম প্রেম নিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে; যিনি অনন্ত, তিনিই ঈশ্বর।

কোটী সূর্য্য, কোটী চন্দ্র, কোটী গ্রহতারকসমন্বিত এই ব্রহ্মচক্র যখন জন্মগ্রহণ করে নাই তখনও যিনি ছিলেন; জন্মগ্রহণ করিয়া এই অগণিত সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র এই সুবিশাল গগনমণ্ডলকে যাঁহার ইচ্ছাতে বিচিত্র বসনে বিভূষিত করিল; যাঁহার প্রাণশক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া এই ব্রহ্মচক্রে প্রাণের উৎস উৎসারিত হইয়া গিয়াছে; যাঁহার আদেশে এই ব্রহ্মচক্রে জ্ঞান ও প্রেমের অফুরন্ত উৎসসকল খুলিয়া গিয়া প্রাণীসমূহকে দিবানিশি দেবত্বের অভিমুখে পরিচালিত করিতেছে; যিনি অনন্ত, তিনিই ঈশ্বর। এসো আমরা তাঁহার চরণে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি এবং শতকোটী প্রণিপাত করি। এখনও তাঁহার বিষয় যে না জানিয়াছে, না শুনিয়াছে, তাহার ন্যায় দুঃখী জগতে কেহ আছে কি না সন্দেহ।

তিনি অনাদি—তাঁহার আদি জানিবে কে? সমস্ত ব্রহ্মচক্রের জন্মগ্রহণের আদিতে দাঁড়াইলেও কেহ পরব্রহ্মের আদি বলিতে পারিবে না। যখন এই বিশ্বজগত গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, অন্ধকারও যখন ছিল না; মৃত্যুর উত্তপ্ত নিশ্বাসে যখন এই বিশ্বচক্র দগ্ধ হইতেছিল, মৃত্যুও যখন ছিল না, তখনও একমাত্র যিনি স্বীয় মহিমায় অবস্থিত ছিলেন, তাঁহার আদি বলিতে পারে কে?

তিনি অনন্ত। তাঁহার আদিও নাই, তাঁহার অন্তও নাই। তাঁহার আদিই বা কে জানে, তাঁহার অন্তই বা কে জানে? কাঁর হৃদয়ে এই সত্যবাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কবি বলিতেছেন—অন্ত কোথা তাঁর অন্ত কোথা তাঁর এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে। বিশ্ববিধাতারই ইঙ্গিতে এই বিশ্বজগত প্রকাশিত হইয়া মহাশূন্যে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে এবং তাঁহারই মঙ্গল আদেশে আশ্চর্য্য সুনিশ্চল নিয়মে ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—কে জানে কোথায়—কোথায়? তিনিই আমাদের একমাত্র প্রভু। প্রতি

নিমেষের প্রতি ঘটনা, আমাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপ, অন্তরের প্রতি ইচ্ছা, প্রতি ভাব তাঁহারই মঙ্গলবিধানে নিয়মিত হইতেছে। বিশ্বজগতের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সকলেরই ভিতরে তাঁহারই শক্তি অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার ক্লান্তি নাই, তাঁহার শ্রান্তি নাই। দিবসে প্রাণীগণ জীবননির্ব্বাহের জন্য যখন শতবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে থাকে, তখনও তিনি তাহাদের মঙ্গলবিধানে নিরত থাকেন; আবার নিশীথে প্রাণীগণ যখন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া অসহায় ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তখনও তিনি অনিদ্র থাকিয়া তাহাদের মঙ্গলসাধনে প্রতিনিয়ত সচেষ্ট থাকেন। তাঁহাকে বুদ্ধি দ্বারা বা মেধা দ্বারা বা বিদ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না। যে তাঁহাকে অন্তরের সহিত প্রার্থনা করে, তাহারই অন্তরে তিনি প্রকাশিত হন, তাঁহারই নিকটে তিনি ধরা দেন।

আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে তাঁহাকে জানিবার স্পৃহামাত্র নিহিত করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে জানিবার শক্তি ও সামর্থ্যও তিনি প্রত্যেকের অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মবাদী সাধক এই সত্যতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া ঘোষণা করিলেন যে "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই অন্তরে নিহিত আছে; দেশ কাল ও অবস্থানির্ব্বিশেষে ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার অধিকার সকলেরই আছে"।

তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ জান যে, তোমরা প্রত্যেকে সেই মৃত্যুর অতীত অমৃত পুরুষের সন্তান। পিতামাতার মহিমা ও গৌরব ঘোষণা করা যেমন সন্তানের কর্ত্তব্য ও অধিকার, সেইরূপ সেই অনন্তস্বরূপ অমৃত পুরুষ পরম পিতামাতার জ্ঞান প্রেম ও শক্তি উপলব্ধি করিয়া নির্জ্জনে ও সজনে, নিজের অন্তরে ও জনসাধারণের সমক্ষে নির্ভয়ে অবিরাম ও অবিশ্রান্ত প্রচার করা আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য ও অধিকার। তিনিই সকল ভয়ের ভয়। আপনাকে তাঁহার সন্তান জানিয়া অভয়প্রাপ্ত হও। তাঁহার মাভৈ মন্ত্র দিনে নিশীথে, শয়নে জাগরণে অন্তরে ধারণ কর এবং দিকে দিকে তাঁহার পবিত্র নামের বিজয়পতাকা বহন করিয়া গৃহে গৃহে নবজাগরণ আনয়ন কর। তোমাদের জীবন নববলে বলীয়ান হউক; তোমাদের হৃদয় নবভাবে ও নবোৎসাহে সমুজ্জ্বল হউক; তোমাদের আত্মা সকলের সম্ভজনীয় সেই পরমাত্মার পবিত্র সংস্পর্শ লাভের অধিকারী হউক।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপকরণ (১)

আমরা দেখিতেছি, গত ১লা বৈশাখে ব্রাহ্মসমাজ ১০০ তম বৎসরে প্রবেশ করিয়াছে। যে ভাবে ব্রাহ্মসম্বৎ চলিয়া আসিতেছে, তদনুসারে আমাদের কাগজে পত্রে ১০০ ব্রাহ্মসম্বৎ বলিয়াই লেখা হইতেছে। এবিষয় লইয়া আমরা কাহারও সহিত বিবাদ কলহে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু ইতিহাস এবিষয়ে কি বলে, তাহা আলোচনা করা বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাই আমরা স্থির করিয়াছি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই বলিতে গেলে যখন এ সম্বন্ধে আমাদের শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন, তখন তাহার প্রথম প্রকাশ অবধি আলোচনা করিয়া নিরপেক্ষভাবে দেখিব এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্য কি। বর্ত্তমান বৈশাখ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে আমরা ১৭৬৫ হইতে ১৭৬৮ শক পর্য্যন্ত প্রথম চারি বৎসরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যেটুকু উপকরণ পাইয়াছি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ঐ সকল হইতে আমরা পাই যে, অন্তত তত্ত্ববোধিনীর প্রথম অবধি সকলেরই ধারণা ছিল যে ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন; উহা প্রথমে "ব্রহ্মসমাজ", পরে যথাক্রমে "ব্রাহ্ম্যসমাজ" এবং "ব্রাহ্মসমাজ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; এবং এ সমস্তই পণ্ডিতবর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অনুমোদনে। কমললোচন বসুর বাটীতে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের কোনও উল্লেখই নাই।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় যে উদ্দেশ্য-ঘোষণাপত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার তৃতীয় অনুচ্ছেদে (paragraph) আছে "অনেক সভ্য • • • ব্রহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন"।

১৭৬৫ ভাদ্র সংখ্যা—আমরা দেখি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ৪ বৈশাখে "ব্রহ্মসমাজে" ব্যাখ্যান দেন। ১লা জ্যৈষ্ঠেও "ব্রহ্মসমাজে" ব্যাখ্যান দেন।

আশ্বিন ২য় সংখ্যা—"এই কলিকাতা নগরে "ব্রহ্মসমাজ" স্থাপিত হইয়াছে"। "এই প্রকার "ব্রহ্মসমাজ" যাহাতে স্থানে স্থানে স্থাপিত হয়।" ১লা শ্রাবণে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ "ব্রহ্মসমাজে" ব্যাখ্যান দেন। ২রা আশ্বিনে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় "ব্রহ্মসমাজে" ব্যাখ্যান দেন।

১লা মাঘ—সংখ্যা—"রামচন্দ্র শর্ম্মা আচার্য্যঃ" এই স্বাক্ষরে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে—"ব্রাহ্ম্যসমাজ—আগামি ১১ মাঘ…সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম্যসমাজ হইবেক।" এই সংখ্যাতেই বাহির হইয়াছে—"ব্রাহ্মসমাজের প্রথম

এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যানের চূর্ণক।" এই সংখ্যাতেই আছে —"আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শকের গত ১১ মাঘে ব্রাহ্মসমাজে ব্যাখ্যাত হয়। ১লা চৈত্র সংখ্যায় আছে—"সাম্বৎসরিক "ব্রাহ্ম-সমাজ"—"গত ১১ মাঘ মঙ্গলবারে "সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজে গায়ত্রীজপ এবং উপনিষৎ পাঠ হইলে" * * *। এই সংখ্যায় আছে—"উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্রীধর ন্যায়রত্ন মহাত্মা কর্ত্তৃক * * * ১০ ফাল্গুনে "ব্রাহ্মসমাজে" ব্যাখ্যাত হয়।"

১৭৬৬ শক—১ বৈশাখ সংখ্যায়—"সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ" এই হেডিং দিয়া একটী প্রবন্ধ আছে।

১১ মাঘে অক্ষয়কুমার দত্ত যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—"১৭৫১ শকের এই ১১ মাঘ দিবসে এতৎ 'ব্রাহ্মসমাজ' এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন।" "এই মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা 'ব্রাহ্মদিগের' প্রতি অর্পণ কর"।

"ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম—প্রতি বুধবারে সূর্য্যাস্ত সময়ে সাপ্তাহিক 'ব্রাহ্মসমাজ' হইবেক। প্রতি মাসে প্রথম রবিবারে সূর্য্যাস্ত সময়ে মাসিক 'ব্রাহ্মসমাজ' হইবেক। প্রতি বৎসরে ১১ মাঘ দিবসে সূর্য্যাস্ত সময়ে সাম্বৎসরিক 'ব্রাহ্মসমাজ' হইবেক।

১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা—"১৭৬৪ শকে * * * ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার ঐক্য হয়, তাহাতে কিয়ৎমাস সকল কার্য্য 'ব্রাহ্মসমাজের' গৃহেতেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

"তিনি (রাজা রামমোহন রায়) পরলোকগত হইলে * * * ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাও ম্লান হইয়াছিল, * * * এইক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হয়"।

১ ভাদ্র সংখ্যা—"যাঁহাদিগের এই ব্রাহ্মদলভুক্ত হইবার বাসনা থাকে"।

"Report of the Tuttuvoadhinee Subha 1843-44"এ—"The meetings of the Braumhu Sumauj are now attended &c."

১ আশ্বিন সংখ্যা—"ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্নগৃহে"

"ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা—১ শ্রাবণ ১৭৬৬"

"পাঠশালার নিয়ম—"ব্রাহ্মসমাজের দিবসে" &c

১ কার্ত্তিক সংখ্যা—"ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা—২১ ভাদ্র ১৭৬৬"; "৪ আশ্বিন ১৭৬৬"; ১৮ আশ্বিন ১৭৬৬; ৬ অগ্রহায়ণ ১৭৬৬; ৫ পৌষ ১৭৬৬; ১৯ পৌষ ১৭৬৬; ৭ মাঘ ১৭৬৬;

"প্রতি ব্রাহ্মসমাজে শত শত মনুষ্য" &c.

"ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের" &c,

১ মাঘ সংখ্যা—"ব্রাহ্মসমাজ—আগামী ১১ মাঘ * * * সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক ইতি শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা আচার্য্যঃ"

১ ফাল্গুন সংখ্যা—"সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ"

মাঘোৎসবের বক্তৃতায় ভবানীচরণ সেন বলেন "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় * * * এই ব্রাহ্মসমাজ ১৭৫১ শকের এই ১১ মাঘ দিবসে এই স্থানে সংস্থাপন করিয়াছিলেন"। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বলেন—"এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বিধি * * * পূর্ব্বক গৃহীত" &c.

"অনেক ব্রাহ্মকে" * * * "সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্ম দ্বারা পরিপূর্ণ হয়"।

মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"বিধিনিষেবিত প্রতিজ্ঞাশীল ব্রহ্মোপাসক অনেকে হইতেছেন যাঁহারা ব্রাহ্ম নামে বিখ্যাত হইয়াছেন"। "শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যিনি তৎকালে ব্রাহ্মদল স্থাপনে অধিক উৎসাহী ছিলেন, তিনিই এইক্ষণকার ব্রাহ্মদিগের আচার্য্য হইয়াছেন"। * * * "তিনি ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে" &c. * * * "অনেক ব্রাহ্মই" &c. * * * "এদেশ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা পূর্ণ কর"।

"ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন"।

"ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ" &c।

১৭৬৭—১ বৈশাখ—"তদনন্তর শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ যত্ন দ্বারা মাণিকতলাতে ব্রহ্মোপাসনা জন্য ক্ষুদ্র আকারে আত্মীয় সভা নাম্নী এক সভা সংস্থাপিতা হয়, তাহাতে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক ব্যাখ্যান করিতেন। পরে যখন ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে ব্রাহ্মসমাজ যোড়াসাঁকোস্থ বর্ত্তমান গৃহে স্থাপিত হইল, তখন তিনি তাহার একজন অধ্যক্ষ হইলেন"। * * * "ফলতঃ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় শাস্ত্রালোচনা জন্য এবং ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যাতৃত্ব কর্ম্ম সম্পাদন জন্য * * * সংস্কৃত কালেজের সম্পাদকীয় কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন"।

গৌতম-বুদ্ধ।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ)

পূর্ব্বকথা।

'তাইতো, জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন আমি'!—ব্রাহ্মণ-তনয় সুমেধ ভাবিতে লাগিলেন,—'এই রোগ-শোক-তাপ, জন্ম-জরা-মরণের পারে সুখময়, শান্তিময় কোনো অবস্থা আছে কি?' ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে, বদ্ধ-মানবের মুক্তির কোন-না-কোন পন্থা নিশ্চয়ই

আছে। সেই নির্ব্বাণ মুক্তির পথ কোথায়? কি সে পথ? সুমেধ ভাবিতেই থাকিলেন, কিন্তু এ ভাবনার অন্ত কোথায়? অন্তরে তাঁহার দারুণ অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিল। ধনৈশ্বর্য্য, পরিজন বিষবৎ বোধ হইল। যথা-সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া সুমেধ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। আজ সুমেধ তাপস, অরণ্যবাসী, ফলমূলাহারী।

সেই যুগে এক নরোত্তম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার নাম দীপঙ্কর বুদ্ধ। যে অরণ্যে তাপস সুমেধ বাস করিতেন, একদিন দীপঙ্কর তাহার নিকট দিয়া কোনো স্থানে গমন করিবেন। চতুর্দ্দিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বহু লোক আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া তাঁহার জন্য পথ প্রস্তুত করিতেছে। সুমেধও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি দেখিলেন, পথের এক অংশ কর্দ্দমাক্ত। তাহারই সন্নিকটে তিনি বুদ্ধদর্শন-মানসে সতৃষ্ণনয়নে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দীপঙ্কর যখন নিকটবর্ত্তী হইলেন, সুমেধ সেই কর্দ্দমোপরি শয়ান হইলেন;—যেন শ্রীবুদ্ধের শ্রীচরণ কর্দ্দমকলুষিত না হয়। দীপঙ্কর এই অদ্ভুত ভক্তটিকে পঙ্কশয্যা হইতে তুলিলেন। সুমেধের হৃদয়মন্দিরের নিভৃত কন্দরে বুদ্ধত্ব লাভ করিবার জন্য নিরন্তর যে আকুল অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে, দীপঙ্কর তাঁহার দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে তখনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। ত্রিকালজ্ঞ দীপঙ্কর আত্মস্থ হইয়া মনকে ভবিষ্যতের রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন:—সেখান হইতে সে সংবাদ আনিল সুদূর ভবিষ্যতে সুমেধ গৌতম-রূপে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।

সুমেধের চিত্ত আজ আনন্দ-পুলকে ভরিয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা করিলেই তিনি দীপঙ্করের শিষ্যত্ব লইয়া 'অর্হৎ' পদবী লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি আত্মমুক্তি তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন, অর্হৎ হইয়া শুধু স্বীয় মুক্তি-সাধন তাঁহার মনঃপূত হইল না। দীপঙ্করের মতোই তিনি শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভ করিবেন—ইহাই তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, সমগ্র মানবসমাজে সেই জ্ঞান দান করিয়া, তাহাদের মুক্তির উপায় করিয়া দিয়া, তবেই তিনি স্বীয় নির্ব্বাণ চাহিবেন;—তাহার পূর্ব্বে নহে।

এইরূপে সুমেধ আপনার পরম এবং চরম শান্তি তুচ্ছ করিয়া তাপিত মানবের কল্যাণ কামনায় অশেষ দুঃখ-দুর্ব্বিপাক বরণ করিয়া লইলেন। দশপারমিতা সাধনের জন্য তাঁহাকে লক্ষ কল্প ধরিয়া অসংখ্য জন্ম * গ্রহণ করিতে হইল। কারণ দান, শীল (১), নৈষ্কর্ম্য (২), প্রজ্ঞা, বীর্য্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান (৩), মৈত্রী এবং উপেক্ষা (৪)—এই দশটী গুণ সম্যকরূপে আয়ত্ত না করিলে কেহ বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে না।

যথাসময়ে সুমেধের দেহান্ত ঘটিল। সংকল্পানুযায়ী বারাণসীনগরে অপন্নকরূপে তিনি পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিলেন। প্রাপ্তবয়সে বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তিনি বারাণসীর একজন প্রধান বণিকরূপে গণ্য হইলেন। পাঁচশত শকট তাঁহার বাণিজ্যদ্রব্য স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইত। একবার তিনি পশ্চিমে বহুদূরে যাইবেন স্থির করিলেন। যাত্রার প্রাক্‌কালে অপন্নক শুনিলেন নগরের অপর একজন প্রসিদ্ধ বণিকও ঠিক ঐ অঞ্চলে বাণিজ্যযাত্রা স্থির করিয়াছে। তিনি দেখিলেন একসহস্র শকট লইয়া একসঙ্গে চলা সহজ হইবে না। যত লোক যাইবে পথে তাহাদের জন্য আবশ্যকীয় জল, কাষ্ঠ ইত্যাদি পাওয়া যাইবে না এবং যানবাহী পশুদেরও যথেষ্ট খাদ্য মিলিবে না; ফলে পথকষ্টের সীমা থাকিবে না। সুতরাং তিনি সেই বণিকের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে অগ্রে কিংবা পশ্চাতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। অতিবুদ্ধি বণিক অগ্রে যাইলে অধিক বিক্রয় হইবে মনে করিয়া সেইরূপই স্থির করিল। অপন্নক ইহাতে খুসীই হইলেন; কারণ, প্রথম যে যাইবে তাহাকেই রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিয়া যাইতে হইবে, বিস্তৃত জলহীন স্থানে প্রয়োজনমত জলাশয় খনন করিতে হইবে। পশ্চাদ্‌গামী অনায়াসেই সেই পথে চলিতে পারিবে; পরন্তু, পূর্ব্বগামী বণিকের দ্রব্যসম্ভার বিক্রীত হইয়া গেলে, তদনুপাতে স্বীয় দ্রব্যের মূল্যনিরূপণও তাঁহার পক্ষে অতি সহজ হইবে। এই সব ভাবিয়া অপন্নক সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিলেন এবং উক্ত বণিকের যাত্রার প্রায় দেড়মাস পরে নিজের যাত্রার দিন স্থির করিলেন; কারণ তত দিনে স্বীয় লোকজনের এবং যানবাহী পশুদের জন্য প্রচুর নবীন শাক-সব্জী ও তৃণ জন্মাইবে।

পথে দিগন্তবিস্তৃত মরুকান্তার। অগ্রগামী বণিক তাহার অর্দ্ধপথ মাত্র অতিক্রম করিয়াছে এমন সময় সে দেখিতে পাইল বিপরীত দিক হইতে যানবাহন সহ অপর একদল লোক তাহাদের দিকেই আসিতেছে। তাহাদের বসন আর্দ্র, রথচক্র কর্দ্দমাক্ত, হস্তে নবস্ফুট পদ্মপুষ্প; মৃণাল ভক্ষণ করিতে করিতে মহোল্লাসে তাহারা অগ্রসর হইতেছে। উভয় দলের সাক্ষাৎ হইলে, বণিকের কষ্টবাহিত যানগুলি জলপূর্ণ জানিতে পারিয়া তাহারা হাস্য করিয়া উঠিল। তাহাদের দলনায়ক

* সিংহলী মতে ৫৫০ জন্ম।

(১) নীতি; (২) ত্যাগ; (৩) মানসিক দৃঢ়তা; (৪) লাভালাভে উদাসীনতা।

বণিককে বুঝাইল সম্মুখে বিশাল হ্রদ, সেখানে অবিরাম বারিবর্ষণ হইতেছে—কষ্ট করিয়া জলবহনের কোনো প্রয়োজন নাই। তাহারা চলিয়া গেলে, বণিক তাহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া শীঘ্র অগ্রসর হইবার জন্য জলভাণ্ডগুলি নিঃশেষে শূন্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। পথ অতিক্রম করিতে করিতে তাহারা তৃষ্ণার্ত হইল, কিন্তু জল কোথায়! জলাভাবে ক্রমে তাহাদের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া আসিল। সেই সীমাহীন মরুদেশের উত্তপ্ত বালুরাশির মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও জল-রেখাও দৃষ্টিগোচর হইল না। ওদিকে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, ম্রিয়মাণ দিবসের উপর নিশাদেবী তাঁহার গাঢ় অন্ধকার-যবনিকা টানিয়া দিলেন। বণিক তাহার ক্লান্ত, অবসন্ন, সঙ্গীদলসহ হতাশচিত্তে বসিয়া পড়িল। ক্রমে তাহাদের তৃষ্ণাকাতর অবসন্ন দেহ সুষুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়িল।

ইহার প্রায় দেড়মাস পরে অপন্নক সদলে ঠিক এই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। পূর্ব্বগামী বণিককে যাহারা জলভাণ্ড শূন্য করিতে পরামর্শ দিয়াছিল, ঠিক পূর্ব্বের মতই আসিয়া তাহারা অপন্নককে জলভাণ্ড শূন্য করিয়া স্বচ্ছন্দে যাইতে অনুরোধ করিল। অপন্নক উত্তর করিলেন,—"আপনারা নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া যান, আমি কোন জলাশয় না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের জল-ভাণ্ড শূন্য করিব না।" উহারা চলিয়া যাইবার পর অপন্নকের সঙ্গীরা বলিল,—"প্রভু, ঐ ব্যক্তিরা বলিল অদূরে সবুজ বন আছে, সেখানে অবিরাম বারিবর্ষণ হইতেছে, উহাদের হাতে মৃণাল, পদ্ম ও অন্যান্য জলজ পুষ্প রহিয়াছে, বসনও তাহাদের সিক্ত; এমতাবস্থায় জলভাণ্ডগুলি শূন্য করিয়া ভার লাঘব করিলে ভাল হয় না কি? জলবাহী যানগুলির জন্যই আমাদের বিলম্ব হইতেছে;—জল ফেলিয়া দিলে আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিব। ইহার উত্তরে অপন্নক তাঁহার সঙ্গীগণকে একস্থলে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—"মরুভূমিতে তোমরা কখন হ্রদ কিংবা পুষ্করিণীর কথা শুনিয়াছ?"

"না প্রভু, মরুভূমি জলহীন।"

"উহারা বলিল অদূরে সবুজ বন; সেখানে অবিশ্রাম বর্ষণ হইতেছে।"

"তোমরা জলীয় বায়ু অনুভব করিতেছ কি?"

"না।"

"তোমরা মেঘ দেখিতে পাইতেছ কি?"

"না।"

"বিদ্যুৎ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে কি?"

"না।"

"মেঘের ডাক শুনিয়াছ কি?"

"না প্রভু, শুনি নাই।"

তখন অপন্নক কহিলেন—"প্রিয় অনুচরগণ, উহারা মানুষ নহে, উহারা নরভুক্ যক্ষ। পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্যই উহারা এই ফন্দি আঁটিয়াছে।" তার পর ক্ষণকাল মৌনভাবে তাঁহাদের পূর্ব্বগামী ক্ষীণবুদ্ধি বণিকের কথা চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"বন্ধুগণ, এক-বিন্দু জলও নষ্ট করিও না। চল অগ্রসর হও, আমার কথার সত্যতা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে।"

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তাঁহারা নানা সামগ্রীপূর্ণ পাঁচশত শকট দেখিতে পাইলেন। তাহার আশে পাশে বহু পশু এবং নর-কঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অপন্নক আপন লোকজনকে পূর্ব্বগামী বণিকের নির্ব্বুদ্ধিতার ফল বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি মৃত বণিকের মূল্যবান্ দ্রব্যগুলি সঙ্গে লইলেন এবং দূরদেশে ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান্ হইয়া প্রচুর ধনরত্নসহ হৃষ্টচিত্তে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে তিনি প্রজ্ঞাপারমিতা গুণ অর্জ্জন করিলেন।

বোধি-সত্ত্ব * ইহার পর অন্যান্য গুণসাধনের জন্য আরও বহু-জন্ম গ্রহণ করিলেন। সামান্য ত্রুটির জন্য কোনো কোনো বার তাঁহাকে পশুযোনিতেও জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু প্রতি জন্মেই তিনি অল্পে অল্পে বুদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। একবার তাঁহাকে বৃষ-রূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইল। তাঁহার সহোদর অনুযোগ করিল, তাহারা সারাদিন খাটিয়া সামান্য তৃণমাত্র আহার্য্য পায়, অথচ একটি শূকর বিনাশ্রমে ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী পায়। বোধিসত্ত্ব ভ্রাতাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শূকরটিকে নিজে আহার করিবার জন্যই গৃহস্বামী তাহার পুষ্টির নিমিত্ত তাহাকে ভাল ভাল খাদ্য দেয়। গৃহস্বামীর পুত্রীর বিবাহরাত্রেই বোধিসত্ত্বের বিজ্ঞতা প্রমাণিত হইয়া গেল। এইরূপে তিনি প্রজ্ঞা-পারমিতার সাধনব্রত উদ্‌যাপন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব ছদ্দন্ত † নামে এক হস্তিদলপতিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। চুল্ল সুভদ্দা ও মহাসুভদ্দা ‡ নামে তাঁহার দুই মহিষী। একদিন হস্তিরাজ সদলবলে এক কুসুমিত শালবনে আনন্দ-বিহারে গমন করিলেন। চলিতে চলিতে ছদ্দন্ত শুণ্ডদ্বারা একটি শালশাখা আকর্ষণ করিলেন। বায়ু অনুকূল থাকায় যত পুষ্প মহাসুভদ্দার উপর পতিত হইল, প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া থাকায় শুষ্ক

* Buddha in the making. বুদ্ধত্বলাভের সঙ্কল্পের পর হইতেই সুমেধ বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ হইবার জন্য যিনি ক্রমে ক্রমে প্রস্তুত হইতেছেন তাঁহাকেই বোধিসত্ত্ব কহে।

† ষট+দন্ত।

‡ ছোট সুভদ্রা ও মহাসুভদ্রা।

পত্র-শাখা ও পিপীলিকাদি চুল্লসুভদ্দার অঙ্গে ঝরিয়া পড়িল। এই অবহেলা স্বেচ্ছাকৃত মনে করিয়া অল্পবুদ্ধি চুল্লসুভদ্দা ছদ্দন্তের উপর বিষম কুপিত হইলেন। তিনি প্রতিশোধের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অন্য একদিন ছদ্দন্ত মহাসুভদ্দাকে একটি পদ্মফুল উপহার দিলেন। উহাতে চুল্লসুভদ্দার ঈর্ষাগ্নিতে ঘৃতাহুতিই হইল। অসহ্য বেদনায় তিনি প্রতিশোধের সুযোগদানের নিমিত্ত প্রত্যেকবুদ্ধ * সমীপে প্রার্থনা জানাইলেন।

চুল্লসুভদ্দার দেহান্ত হইল। তিনি বারাণসীরাজের মহিষীরূপে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে হঠাৎ তাঁহার একদিন পূর্ব্বজন্মের কথা মনে পড়িল। তিনি রোগের ভাণ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন এবং রাজাকে জানাইলেন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত হিমালয়বাসী ছদ্দন্ত নামক হস্তিদলপতির ছয়শাখাবিশিষ্ট দন্ত তাঁহাকে আনিয়া উপহার দেওয়া না হইবে ততক্ষণ তিনি আহার গ্রহণ করিবেন না। বড় রকমের পুরস্কার ঘোষিত হইল। রাজ্যের যত নিপুণ শিকারীকে সংবাদ দেওয়া হইল। একমাত্র সোণুত্তর এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া উদ্দেশ্য সাধনে হিমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিল।

দিনের পর দিন অরণ্য ভেদ করিয়া বহু আয়াসে সোণুত্তর ছদ্দন্তের নিবাসস্থানে উপস্থিত হইল। ক্ষণকাল পরেই ছদ্দন্ত ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বৃক্ষান্তরাল হইতে সোণুত্তর বিষাক্ত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। ক্রোধোন্মত্ত ছদ্দন্ত সোণুত্তরকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে সংহার করিতে ছুটিলেন। তাহার সমীপস্থ হইয়া নিজেকে একটু সংযত করিয়া তাহাকে ভদাচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সোণুত্তর কাতর অনুনয়ে সমস্ত যথাযথ বিবৃত করিলে, বোধিসত্ত্ব ধ্যানস্থ হইয়া রাজমহিষীর পূর্ব্ব-জন্মকথা সমস্ত জানিয়া লইলেন। তিনি দেখিলেন রাণী কেবল তাঁহার দন্ত লইয়াই সন্তুষ্ট হইবেন না, তাঁহার প্রাণনাশ না হইলে ঐ প্রবল ঈর্ষাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে না। ছদ্দন্ত শয়ন করিয়া সোণুত্তরকে করাত দিয়া দন্ত ছেদন করিতে অনুমতি দিলেন। সোণুত্তরকে অসক্ত দেখিয়া তিনি নিজেই শুণ্ডদ্বারা করাত চালিত করিয়া তাহা ছেদন করিলেন। সোণুত্তর দন্ত লইয়া মহানন্দে প্রস্থান করিল। ছদ্দন্ত এই দানের ফলস্বরূপ বুদ্ধত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা লইয়া দেহত্যাগ করিলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্ব দান, ক্ষান্তি, অধিষ্ঠান ইত্যাদি পারমিতা আয়ত্ত করিলেন।

সত্যের শুভ্র কঠোরতাও তাঁহার মধ্যে পূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। একজন্ম তিনি ভিক্ষাজীবী ছিলেন। ভিক্ষার্থ এক গৃহস্থের বাড়ী গিয়া দেখেন যে গৃহিণী জনৈক পরপুরুষের সহিত বিশ্রম্ভালাপে ব্যস্ত। তিনি একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎ পরে পুরুষটি আহারে বসিল এবং গৃহিণী তাহাকে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিল। লোকটি কিছু আহার করিয়াছে এমন সময় অদূরে গৃহকর্ত্তাকে আসিতে দেখা গেল। গৃহিণী ব্যস্তসমস্তভাবে তাহাকে গৃহকোণে লুকাইয়া রাখিল। গৃহস্বামী আহারে বসিলে গৃহিণী ভুক্তাবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জনের উপর আরো কিছু অন্নব্যঞ্জন চাপাইয়া তাঁহাকে আহার করিতে দিল। গৃহস্বামী উপরে গরম ভাত এবং নীচে ঠাণ্ডা ভাত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহিণী হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না। গৃহস্বামী উহা উচ্ছিষ্ট অন্ন বলিয়া সন্দেহ করিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং গৃহিণী ও লুক্কায়িত লোকটির বিশেষ বিড়ম্বনার আশঙ্কা থাকা সত্বেও সত্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিলেন। গৃহকর্ত্তা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহিণী ও তাহার উপপতিকে সমুচিত শিক্ষা দিলেন।

ইহার পর বারাণসীর রাজপুত্র অসদৃশ-রূপে, বোধিসত্ত্বের বীর্য্যপারমিতার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ অসদৃশ সিংহাসন প্রত্যাখ্যান করিয়া অনুজ ব্রহ্মদত্তকে তাহা দান করেন এবং স্বয়ং তাহার অমাত্যপ্রধানরূপে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। কোন দুষ্ট অমাত্য একবার ব্রহ্মদত্তকে বুঝাইয়া দেয় যে মহাবীর অসদৃশ তাঁহার প্রাণনাশ পূর্ব্বক সিংহাসনলাভের অভিলাষী। অসদৃশকে সকলেই ভয় করিত, কাজেই ব্রহ্মদত্ত গোপনে তাঁহার হত্যার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। অসদৃশ তাহা জানিতে পারিয়া ভ্রাতৃবিরোধ ঘটিতে না দিয়া সম্রাট্ সামান্যের রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। অসদৃশ সেই রাজ্যে শ্রেষ্ঠ বীরের আসন পাইলেন। কিন্তু যিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন তাঁহাকে অশেষবিধ পরীক্ষার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। নবাগতের এই সম্মানলাভে সে রাজ্যের যত ধনুর্ব্বিদ্ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল।

একদিন মহারাজ উদ্যানবাটিকায় একটি আম্রবৃক্ষতলে সুশীতল ছায়ায় শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় সেই বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় একটি সুপক্ক ফল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি অধীনস্থ সকল ধনুর্ব্বিদকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—তোমাদের মধ্যে কে ঐ ফলটি শরনিক্ষেপে ভূতলে আনিতে পার? তাহারা কেহই সাহস করিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইল না। তবে অসদৃশকে মহারাজের সম্মুখে খর্ব্ব করিবার জন্য সকলে তাঁহার নাম করিল। অসদৃশের সঙ্গে ধনুর্ব্বাণ ছিল না দেখিয়া তাহারা ধনুর্ব্বাণ দিয়াও তাঁহাকে সাহায্য করিবে না স্থির করিল।

* যাঁহারা নিজে বুদ্ধত্বলাভ করেন কিন্তু বুদ্ধের মতো অন্যকে মুক্তিপন্থা দেখাইতে পারেন না, তাঁহাদিগকে 'প্রত্যেকবুদ্ধ' বলে।

মহারাজ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অসদৃশ আপন বহিরাবরণ পরিত্যাগ করিলেন এবং বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত বহু বংশখণ্ড একত্র সংযোজিত করিয়া একখানি বিচিত্র ধনু নির্ম্মাণ করিলেন। এই আশ্চর্য্য ধনু দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। অসদৃশ জিজ্ঞাসা করিলেন, তীর উর্দ্ধে উঠিবার সময় অথবা নীচে নামিবার সময় আম্রটি উৎপাটিত করিতে হইবে? তীর পতনকালে করিতে পারিলেই বিশেষ কৌতুকজনক হইবে মনে করিয়া রাজা তাহাই করিতে আদেশ করিলেন। অসদৃশ ধনুতে শরযোজনা করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বিষম বেগে বাণ উর্দ্ধে উত্থিত হইল—তাহার শন্ শন্ শব্দে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ধরামুখী তীরটি দেখিতে দেখিতে ফল বৃন্তচ্যুত করিয়া ধরণীতে ফিরিয়া আসিল। অসদৃশ অগ্রসর হইয়া একহস্তে ফল এবং অপর হস্তে শরটি ধারণ করিলেন। নির্ব্বাক বিস্ময়ে সকলে এই অদ্ভুতকর্ম্মার প্রতি চাহিয়া রহিল। তাঁহার এই অব্যর্থ শরসন্ধানে প্রীত হইয়া মহারাজা তাঁহাকে প্রচুর বিত্ত দান করিলেন।

এদিকে অসদৃশের অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া সাত-জন নৃপতি মিলিতশক্তিতে বারাণসী অবরোধ করিলেন। ব্রহ্মদত্ত উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে অসদৃশের নিকট ক্ষমা চাহিয়া সংবাদ পাঠাইলেন। রাজ্য সিংহাসন দেওয়া সত্বেও তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া যে ভ্রাতা তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, বিপদের সময় তাহার আকুল আহ্বান তাঁহাকে বিচলিত করিল। ভ্রাতার উদ্ধারের জন্য অসদৃশ অবিলম্বে বারাণসী যাত্রা করিলেন। বারাণসী নগরতোরণ হইতে তিনি নৃপতি-গণের উদ্দেশে শরমুখে একখানি পত্র প্রেরণ করি-লেন। পত্রে লিখিলেন—'এই অসদৃশের প্রথম বাণ। তাহার দ্বিতীয় বাণ আপনাদের পক্ষে খুব শুভকর হইবে না।' এমন অদ্ভুতভাবে অসদৃশের আগমনবার্ত্তা পাইয়া কেহই উহাতে সন্দেহ করিতে পারিল না; কারণ তাহারা সকলেই জানিত যে অসদৃশ ছাড়া এমন অসদৃশ শরসন্ধান আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে। নৃপতিগণ ভয়ে বারাণসী পরিত্যাগ করিলেন। অসদৃশ এইরূপে বীর্য্যপারমিতা সাধন করিয়া তপস্যার্থ হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

বাল্যকালে বাড়ীতেই আমাদের নিঃস্বার্থ ভালবাসার শিক্ষা আরম্ভ হয়। ভাল পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায় যে বাড়ীর লোকদের মন কিসে ভাল হইবে, কি করিলে কাহারও সামান্য একটু সুবিধা বা সাহায্য হইবে, তাহার প্রতি অতি অল্প বয়সেই তাহাদের দৃষ্টি পড়ে। তাহারা এইরূপ চেষ্টায় একটা আনন্দ পায়। কোন কোন পরিবারের নিয়ম এই যে পিতামাতা ছেলেমেয়েদের হইতে দূরে দূরে থাকেন, তাহাদের সঙ্গে তেমন ভাল করিয়া মেশেন না, তাহাদের হাসি-গল্প আমোদ-প্রমোদে যোগ দেন না। যে সকল পরিবারে দূরে দূরে থাকার নিয়ম নাই, সেখানে প্রতিদিনের জীবনের সকল ঘটনাতেই পরস্পরের সঙ্গে যোগ ও সহানুভূতি আরও দৃঢ় হয়। ইহাতে আমাদেরও উপকার, ছেলেমেয়েদেরও উপকার। তাহারা যদি দেখিতে পায় যে কি করিলে বাড়ীর সকলের মন ভাল হইবে আমরা সর্ব্বদা সেই কথা ভাবি ও সেই চেষ্টা করি, পাছে কোন শক্ত কথা বলিলে কাহারও মনে ব্যথা লাগে এই জন্য তেমন কথা মনে আসিলেও আমরা মুখে বলি না, আমরা রাগ ও বিরক্তি দমন করিবার সর্ব্বদা চেষ্টা করি, কেহ মন্দ ব্যবহার করিলেও আমরা তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে বিরত থাকি—যে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পিতামাতার ব্যবহারে এইরূপ ভালবাসা সংযম ও সহানুভূতির দৃষ্টান্ত দেখে সে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা অতি অল্পবয়সেই প্রেমের দীক্ষা লাভ করে। তাহাদের জীবনে দিন দিন আনন্দ শান্তি ও কোমলতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

কিন্তু বিস্তৃতিই প্রেমের স্বভাব। স্নেহ প্রেমও পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। এই প্রকার সঙ্কীর্ণ যে ভালবাসা তাহা ত স্বার্থ। সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতাই অধর্ম্মের মূল। আমাদের প্রেম পরিবা-রের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া সমাজকে ও সমগ্র মানব-মণ্ডলীকে আলিঙ্গন করিবে। সংসারে এরূপ লোক বিরল নহে যাহারা দুঃখ-বিপদে অতি নিকট প্রতিবেশীর মুখের দিকেও চাহিয়া দেখে না। তাহাদের স্নেহপ্রীতি পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ।

আমাদের সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া প্রেমের সীমা ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হওয়া উচিত। গৃহে ও পরিবারে যে প্রেমের শিক্ষা আরম্ভ হয় সমাজক্ষেত্রে সেই প্রেমই আমাদিগকে বন্ধু-বান্ধব আনিয়া দেয়। প্রকৃত ভদ্রতার মূলেও প্রেম। যাহার অন্তরে ভালবাসা আছে তাহারই ব্যবহার মিষ্ট। আপনাকে ভুলিয়া যে অপরের সুখ অসুখ, সুবিধা অসু-বিধার কথা চিন্তা করে তাহারই ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হয়। সকলেই তাহাকে আপনার লোক বলিয়া মনে করে। স্বার্থপরতার মত বন্ধুত্বের শত্রু আর নাই। যাহার অন্তরে প্রীতি ও সদ্ভাব নাই তাহার ভদ্রতা কেবল ছদ্মবেশ—এ কথা লোকের বুঝিতে বড় অধিক সময় লাগে না।

পরিবার হইতে প্রেম সমাজ মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে বটে, কিন্তু এখানে একটী বিপদ আছে। সমাজের লোকজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে তাহারা আমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, তাহাদের উপকার করিলে তাহারা আমাদের প্রত্যুপকার করিবে—এইরূপে প্রেমের পশ্চাতে গূঢ়ভাবে স্বার্থ লুক্কায়িত থাকিতে পারে। যেখানে কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদানের আশা থাকে সেখানে প্রেমের পূর্ণতা নাই। সে প্রেম সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য নহে।

প্রেম যে কত উচ্চ ও কত সুন্দর হইতে পারে দাম্পত্য প্রেমে আমরা তাহার পরিচয় পাই। স্বামী স্ত্রীর জন্য ও স্ত্রী স্বামীর জন্য একেবারে আপনাকে ভুলিয়া যান। আদর্শ বিবাহে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে একহৃদয় হইয়া যান। একজনের জীবনের ছোট-বড় সকল ব্যাপার আর একজন আপনার করিয়া লন। এক জনের অন্তরের ক্ষুদ্রতম সুখদুঃখ অপরের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়। একজনের জীবনের কোন কথাই অপরের নিকটে উপেক্ষার বিষয় থাকে না। কিন্তু এখানেও বিপদ আছে। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে পাইয়া আর সকলকে ভুলিয়া যাইতে পারেন। যে প্রেমের বিস্তৃতি নাই তাহার সঙ্কোচ অনিবার্য্য। ক্রমে তাঁহাদের প্রেম ক্ষীণ ও শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে; তাঁহারা আর পরস্পরকে সুখী করিতে পারেন না। কত বিবাহের যে এইরূপ শোচনীয় পরিণতি হয় তাহা বলিবার নহে।

শুধু স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে ভালবাসিলেই হইবে না, শুধু পরিবারের আর সকলকে ভালবাসিলেই হইবে না, বন্ধুবান্ধবকে ও আপন আপন সমাজের লোকদেরও ভালবাসিলে হইবে না; কিন্তু যাহাদের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, যাহাদের সঙ্গে পরিচয় পর্য্যন্ত নাই, যাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ প্রতিদানের আশা বা সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নাই, তাহাদিগকেও ভালবাসিতে হইবে। সকল শ্রেণীর ও সকল প্রকৃতির লোকদের প্রবল অনুরাগের সহিত ভালবাসিতে হইবে; এমন কি, যাহারা আমাদিগকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখে, তাহাদেরও সর্ব্বান্তঃকরণে মঙ্গল কামনা করিতে হইবে এবং প্রদীপ্ত উৎসাহের সহিত তাহাদের সেবা করিতে হইবে। আত্মবিস্মৃত প্রেম বড় মধুর, আত্মবিস্মৃত সেবা বড় পবিত্র। ইহাই শ্রেষ্ঠ জীবন, ইহাই পরম ধর্ম্ম।

এই প্রেমের অনেকগুলি শত্রু আছে, তাহাদের মধ্যে দুইটী প্রধান। এই দুটীর একটী আলস্য অপরটী ভোগবিলাস ও আমোদপ্রমোদের উত্তেজনা। আমরা এত অলস যে আমাদের কথায় ও কাজে অন্যের মনে কষ্ট হইবে কি না তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। আমরা স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দিই, কিন্তু একবার চাহিয়া দেখি না যে কূলে দাঁড়াইয়া কত লোক ক্রন্দন করিতেছে। অথবা আমরা আমোদ প্রমোদে এমন উন্মত্ত হই যে অন্যের কথা ভাবিবার আর অবসর থাকে না। এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হইবে এবং তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা সংগ্রাম করিতে হইবে।

নরনারীর সুখ দুঃখে যিনি আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিতে শিখিয়াছেন, বহিঃপ্রকৃতি তাঁহার অতি নিকট আত্মীয়ের মত প্রিয় হইবে। প্রকৃতির কান্তি প্রত্যেক স্থানেই বিভিন্ন প্রকার; এবং একই স্থানে দণ্ডের পর দণ্ড, দিবসে ও নিশীথে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দিনের পর দিন শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় প্রকৃতির মুখশ্রীর অবিরাম পরিবর্ত্তন হইতেছে। যিনি নিখিল মানবের প্রতি প্রেমে অভ্যস্ত হইয়াছেন তিনি সহজেই প্রকৃতির সহিত একাত্মা হইয়া যাইবেন। একটী ক্ষুদ্র বনফুল, নদীর বক্ষে তরঙ্গলীলা, মেঘমালার নিত্য নব নব রূপ—সকলই তাঁহার চক্ষে সুন্দর লাগিবে, সকলই দেখিয়া তিনি তন্ময় হইয়া যাইবেন। প্রকৃতির রহস্যমন্দিরের দ্বার তখন তাঁহার মুগ্ধনেত্রে উন্মুক্ত হইবে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাওয়ার আনন্দ কথায় প্রকাশ করা যায় না।

পরিশেষে আমরা ধর্ম্মজীবনের মধুরতা অনুভব করিব। ভগবানের সহিত আমাদের অন্তরের নিভৃত প্রদেশে যে সম্বন্ধ আমরা অনুভব করি, তাহা প্রেমের সম্বন্ধে পরিণত হয়। আমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ করুণা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আমাদের মনে উদয় হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা দূর করিয়া দিব, কোন পাপচিন্তা মনে আসিলে আমরা লজ্জাবোধ করিব। পতিব্রতা সাধ্বী রমণী স্বামীকে যেরূপ ভালবাসেন আমরা ভগবানকে সেইরূপ ভালবাসিব, কেবল এই প্রেমের সঙ্গে ভক্তির সম্ভ্রম, অনন্তের গভীরতা ও পরিপূর্ণ শুদ্ধতা বিজড়িত থাকিবে। ইহাই সত্য পূজা, ইহাই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ, ইহাই প্রেমের উচ্চতম অবস্থা, ইহাই ব্রহ্মসহবাস।

মহাভারতের প্রক্ষিপ্তবাদ।

(শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম-এ, বি-এল)

বর্ত্তমান মহাভারতের কোন অংশ পরিত্যাগ দুঃসাহসের কথা।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমানাকারে প্রাপ্ত মহাভারতের কোন্ অংশ তাঁহার নিজের রচনা এবং কোন্ অংশ অপর কর্ত্তৃক রচিত হইয়া উক্ত মূল মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—এ বিষয়ে সুধীবৃন্দ মধ্যে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ

কেহ নিজ কল্পনানুযায়ী মহাভারত হইতে কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বাদ দিয়া বাকী অংশই বেদব্যাসপ্রণীত খাঁটি মহাভারত বলিয়া প্রচারে ব্যস্ত।

কিন্তু চিন্তনীয় যে মূল মহাভারত প্রায় পঞ্চসহস্রাধিক-বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তদবধি তাৎকালীন স্বাধীন আর্য্যজাতির রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম ও অন্যান্য নানা-বিধ বিপ্লবাদিতে আর্য্যজাতি ও তাঁহাদের গৌরবের সকল "কিছুরই" মধ্যে সেই বিপ্লবের আঘাত প্রবিষ্ট হইয়াছে। আজ আর সেই বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বের সেই আর্য্য-জাতিও নাই, তাঁহাদের পুরাকীর্ত্তিসমূহও বিপর্য্যস্ত; তাঁহাদের শাস্ত্রাদি, ইতিহাস, পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থাদিনিচয়ও সে বিপর্য্যয়ের হস্ত হইতে একেবারে ত্রাণ যে পায় নাই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ উক্ত গ্রন্থাদির মধ্যে অনেক-গুলিতে যথেষ্টই পাওয়া যায়। উক্ত নানা বিপ্লবের মধ্যে আর্য্যজাতিরই ন্যায় তাঁহাদের গৌরবের অন্যতম হেতু—বেদব্যাসরচিত মূল মহাভারতখানিও কালবশে লুপ্ত এবং এতকাল পরে সেই মূল গ্রন্থ (Original Edition) পাইবার কল্পনা বাতুল ব্যতীত অন্য কেহ করিতে অক্ষম। তবে অধুনা বেদব্যাস-রচিত বলিয়া খ্যাত যে মহাভারত তাহার সমগ্র অংশই তাঁহার রচিত নহে বলিয়া কাহারও নিজ সন্দেহানুযায়ী বর্ত্তমান মহাভারত হইতে কোন অংশ বাদ দিলে হঠকারিতা হইবে বলিয়া মনে হয়। এবিষয়ে ধীরভাবে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং যাতিমত বিদ্বৎসমাজে তথা সাধারণের নিকট উপস্থিত করতঃ তাঁহাদের সকলের দ্বারা বিবেচিত ও বিচারিত হইলে পর সকলের মত জানিয়া তদনন্তর বর্ত্তমানের মহাভারত হইতে বাদ দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যবস্থা করাই সমীচীন মনে হয়। বর্ত্তমানে ব্যক্তিবিশেষের মতানুযায়ী প্রক্ষিপ্তাংশরূপ পরাধীনতার নিগড় হইতে বাদরায়ণির মূল "মহাভারত" উদ্ধার বাতিকে পরিণত হইয়া যাহাও বা আছে তাহারও নাশ যাহাতে না হয় এবং ধীরচিত্তে সকলে বিচার ও মীমাংসা করেন তাহাই কামনা করিয়া সেই বিচারের যৎসামান্য সহায়তাকল্পে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণ।

মহাভারতের বিভিন্ন সংস্করণ।

মহাভারত আদিপর্ব্বান্তর্গত অনুক্রমণিকাধ্যায়ে উল্লি-খিত কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য :—

(১) "ভারতসংহিতা প্রথমতঃ চতুর্ব্বিংশতিসহস্র শ্লোকে বিরচিত হয়। তাহাতে উপাখ্যানভাগ এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

(২) "পরিশেষে মহর্ষি সার্দ্ধশত শ্লোকময়ী অনুক্রম-ণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সংকলন করিলেন।

(৩) "বেদব্যাস এই মহাভারত প্রস্তুত করিয়াই সর্ব্বাগ্রে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান।

(৪) "পরে অনুরূপ শিষ্যমণ্ডলীতে তাহা বিতরণ করেন।

(৫) "অনন্তর ষষ্টিলক্ষ শ্লোকাত্মক অন্য ভারতসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন।

(৬) "ঐ ষষ্টিলক্ষের মধ্যে.........নরলোকে এক-শতসহস্র শ্লোক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

(৭) "নারদ দেবলোকে মহাভারত সুপ্রচার করেন। অসিত দেবল পিতৃলোকে ও শুকদেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে শ্রবণ করান এবং

(৮) "ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন মনুষ্যলোকে ভারত কীর্ত্তন করেন।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশ হইতে জানা যাইতেছে যে ব্যাসদেবের জীবিতকালেই তৎকর্ত্তৃক মহাভারতের তিনটী বিভিন্ন সংস্করণ বা Editions রচিত হইয়াছিল।

মহাভারত।

(অ)

প্রথম সংস্করণ—২৪ হাজার শ্লোকযুক্ত। ইহাতে উপা-খ্যানভাগ একেবারে ছিল না।

দ্বিতীয় সংস্করণ—উক্ত ২৪ হাজার শ্লোকের সহিত মহর্ষি ব্যাস একশত পঞ্চাশটি শ্লোক যোগ করেন। সুতরাং এই দ্বিতীয় সংস্করণের শ্লোকসংখ্যা ২৪১৫০ মাত্র।

এই দ্বিতীয় সংস্করণে শেষোক্ত ১৫০ শ্লোকে মহর্ষি "ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার-সংকলন" (Index ?) করিলেন।

(আ)

তৃতীয় সংস্করণ—(ক) ৬০ লক্ষ "শ্লোকাত্মক" [অর্থাৎ ঠিক ঐ সংখ্যক না হইয়া কমবেশি হইতে পারে, যথা—"শতখানেক" শব্দে সঠিক একশতই বুঝায় না, এক শতের কিছু কম বা বেশীও হইতে পারে]।

(খ) "অন্য এক ভারতসংহিতা" মহর্ষি রচনা করিয়াছিলেন। "অন্য এক" শব্দ প্রতি লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইবে যে এই নব সংস্করণভুক্ত মহাভারত প্রথম দুই সংস্করণ হইতে পৃথক ছিল।

(গ) এই তৃতীয় সংস্করণের মাত্র "এক লক্ষ শ্লোক নরলোকে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে"।

এমতাবস্থায় "মহাভারত" উদ্ধারপ্রয়াসী জনের বলা উচিত যে কোন্ সংস্করণের মহাভারতকে তিনি মূল মহাভারত আখ্যা দিবেন এবং কোন্ সংস্করণের মহাভারত তিনি উদ্ধারেচ্ছু।

আদি মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণদ্বয় যে অল্পসংখ্যক শ্লোকযুক্ত ছিল তাহাও যেমন কেবলমাত্র বর্ত্তমান মহাভারত হইতেই জ্ঞাত হওয়া যায় তেমনই বর্ত্তমান মহাভারত হইতেই ইহাও জানা যায় যে উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণদ্বয় ব্যাসের আমলেই লুপ্ত অথবা তৃতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং শ্লোকাধিক্যদৃষ্টে তৃতীয় সংস্করণ মহাভারত ব্যাস রচিত নহে বলিয়া উড়ান যায় না এবং বর্ত্তমান লক্ষসংখ্যক শ্লোক তাঁহার নহে বলিয়া হঠাৎ পরিত্যাগ করা উচিত মনে হয় না। এগুলি যে ব্যাসের রচিত নহে—সে বিষয়ের প্রমাণ কি? তদ্বিষয়ের প্রমাণ দিতে না পারিলে প্রমাণাভাবাৎ তদ্বিষয়ই ত্যাজ্য হইবে না কি?

এমতাবস্থায় আদি দুই সংস্করণ মাত্রই মহাভারত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে ও বর্ত্তমান বা তৃতীয় সংস্করণ তদ্রূপ গ্রাহ্য নহে বা হইতে পারে না একথা সাধু মনে হয় না। যদি কখন কেহ আদি দুই সংস্করণ উদ্ধার করিতে পারেন তিনি ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই ও তাহা পুরাতত্ত্ববিদের সাফল্য সূচিত করিতে পারে। তাই বলিয়া তৃতীয় বা বর্ত্তমান সংস্করণ পরিত্যাজ্য কেন হইবে? ইহাও তো ব্যাসদেবেরই রচনা বলিয়া উক্ত আছে। উভয়ের প্রমাণ-স্থানও একই, অর্থাৎ বর্ত্তমান মহাভারতই।

মহাভারত—প্রহেলিসমাচ্ছন্ন, মহাভারত—বোঝা চাই।

মহাভারত-পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে মহাভারত নানা প্রহেলি-সমাচ্ছন্ন। মহাভারতের আদি অনুক্রমণিকাধ্যায়েই উক্ত আছে, কি কারণে "ব্যাস স্থানে স্থানে গ্রন্থ-গ্রন্থিস্বরূপ কূটশ্লোক রচনা করিয়াছেন"; ঐ সকল ব্যাসকূটের "অদ্যাপি কেহ অর্থ করিতে পারেন না"। এমন কি ."সর্ব্বজ্ঞ গণেশকেও" ঐ সকলের অর্থ চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইত।

যাহোক, এমতাবস্থায় মহাভারত হইতে কিছু হঠাৎ বাদ দিবার পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থ বিশ্লেষণ করতঃ সম্যক বা ভালরূপে বোঝা প্রথমেই আবশ্যক। বর্ত্তমান মহাভারতের প্রতি খড়্গাহস্তজনগণ উহা সম্যক বোধের পরিচয় সাধারণ্যে প্রকাশ না করা পর্য্যন্ত তাঁহাদের পাশ্চাত্য উপাধিরাশি দর্শাইয়া বা তৎমাহাত্ম্যবলে সাধারণের ধাঁধাঁ লাগাইয়া যদি একেবারেই মহাভারত হইতে স্বেচ্ছামত অংশসমূহ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট রহিবে তাহাই মহাভারত বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করেন তবে তাহা নিতান্তই "গা জোরের" কার্য্য হইবে কি না ও তাহাই মহাভারত বলিয়া মান্য হইবে বা হইতে পারে কি না তাহা সুধীজন ও সর্ব্বসাধারণের বিবেচ্য।

মহাভারত বুঝিবার ক্রম।

এক্ষণে মহাভারত বুঝিবার জন্য মহাভারতের কুহেলি বা প্রহেলির মধ্য হইতে নানা স্থানে ছড়ান ও লুকান কথাগুলি খুঁজিয়া বাহির করতঃ একত্রিত বা Index করা আবশ্যক। এবিষয়ে এদেশে সবিশেষ চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ পর্য্যন্ত মাত্র একটি এরূপ পুস্তক বাংলা ভাষায় দেখিয়াছি। তাহাও রচয়িতার শ্রেণীবাৎসল্যের পরিচায়ক—তদ্বিপরীত ভাবযুক্ত মহাভারতোক্ত অনেক বিষয়ই উক্ত পুস্তক হইতে রচয়িতা বাদ দিয়া অন্যায় করিয়াছেন। আমি এই জন্য মহাভারতের একটী সম্পূর্ণ Index করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে অবসর ও সুযোগ অভাবে কর্ম্ম অসমাপ্ত রাখিতে বাধ্য হইয়াছি। এ বিষয়ে যিনি বা যাঁহারা অবহিত ও যাঁহাদের সবিশেষ সময় ও সুযোগ আছে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিলে আর্য্যজাতির মহোপকার করিবেন।

মহাভারতে একই বিষয় বহুস্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা হেতু মহাভারতোক্ত বিভিন্ন বিষয় একত্র সংগ্রহ করতঃ একে একে আলোচ্য।

মহাভারতের যে তিনটি সংস্করণের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে তাহাতে রচয়িতা কবির অন্তরের তিনটি স্তরের বা পর্য্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় সংস্করণ রচনাকালে বা স্তরে সংক্ষেপে বা বীজাকারে সর্ব্ববৃত্তান্ত কবির মনে উদয় হয়, তাহা তিনি মাত্র ১৫০ শ্লোক মধ্যে গ্রথিত করিয়াছিলেন। ইহা ব্রহ্মসূত্রাদি রচয়িতা মহর্ষির চিন্তার গভীরতার অপূর্ব্ব নিদর্শন। সম্ভবতঃ এই বীজই ভাবীকালে পূর্ণ বিকাশ লাভে ৬০ লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাগ্রন্থে পরিণত ও "অন্য এক ভারত সংহিতার" রূপ গ্রহণ করিয়াছিল।

ঐ যে আখ্যায়িকাভাগ বা নিখিল বৃত্তান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে ইহা লক্ষীভূত বা focussed হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া কুরুপাণ্ডবের ইতিহাসে অথবা বলা যায় মহাভারতের আখ্যায়িকাভাগের মূল—শ্রীকৃষ্ণে কেন্দ্রীকৃত কুরুপাণ্ডবের ইতিহাস।

অর্চ্চনা।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি সহ।

কল্যাণ—তেওরা।

ওঁ পিতা তুমি। জ্ঞানদাতা হে। নমি তোমা—
ছেড়োনাকো মোরে।
স্বতেক দেব হে পিতা দুরিত মোর করি' দূর
আশীষ তব বরিষ।
নমি দেব শম্ভব শুভদাতা হে
নমি দেব শঙ্কর শুভাকর হে
নমি দেব শিব শিবতর তোমায় হে॥

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

II
৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
সাঃ রঃ I {পা -া স্মপা। গা -া। রা -া I গা ধা পা। পরা গা। রা সা I
ওঁ পি তা • • • তু • মি • জ্ঞা • ন দা • • তা হে

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I -া সা ধ্া। সা -া। সা সা I রা গা পা। পা ধা। র্সা -া I
• ন মি তো • মা ছে ড়ো না কো মো • রে •

১´ ২ ৩
I ধর্রা র্সর্সা ধপা। গপা গরা। সা রা} I
•• • • •• • • • • • "পি"

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
গা I গা -া গা। পাঃ স্মাঃ। ধা -া I পা ধপা র্সা। -া র্সা। র্সা র্সা I
স্ব তে • ক দে • ব • হে পি• তা • দু রি ত

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা -া র্সা। র্সা র্সা। র্সা -না I র্রা র্সর্সা গা। -া গা। -া গা I
মো • র ক রি' দূ • • • র আ • শী • ষ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I রা রা ন্া। রা সা। সা সা I সা -া রা। রা -া। রা রা I
ত ব ব রি ষ ন মি দে • ব শ • ম্ভ ব

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I রা রা রা। সরা গা। গা গা I -া রা গা। স্মা -া। স্মা স্মা I
শু ভ দা •• • তা হে • ন মি দে • ব শ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I -া স্মা স্মা। স্মা স্মা। গা স্মা I পা পা পা। পা -া। স্মা পা I
• ঙ্ক র শু ভা • • • ক র হে • ন মি

১´	২	৩	১´	২	৩
I ধা -া ধা |	ধা ধা |	পা ধা I	না না না |	না -া |	ধা না I
দে • ব	শি ব	শি ব	ত ব তো	মা •	• •

১´	২	৩
I র্রা র্সর্সা র্সা |	র্সা -া |	সা -া I
• •• র্	হে •	ঙ •

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ইমন পূরবী—দাদরা।

শান্ত সন্ধ্যা এল আকাশ জুড়ে
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে।
প্রাণ ভরে গো ডাক তাঁরে সেই অকূলের কূলে।
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে ॥
প্রাণের কথা যত কিছু বল তাঁরে বল খুলে
বেড়ায়ো না হেথা-সেথা মরি' বৃথা ঘুরে।
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে ॥
ভক্তিসিক্ত হয়ে তাঁরি দাঁড়াও চরণমূলে
গন্ধে বর্ণে ফুটুক চিত্ত প্রেমের হাওয়ায় দুলে
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে।
প্রিয়তম সখা তোমার নাইকো জেনো তিলেক দূরে
দেখবে তিনি আছেন হৃদে অশ্রুজলে ধুলে
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে ॥
এমন মধুর সন্ধ্যাবেলা—প্রেমভক্তি নানা ফুলে
চিত্ত-সাজি সাজাইয়া দাও গো তাঁরি পায়ে তুলে।
ডাকবার মত ডাক তাঁরে ব্যাকুল-করুণ সুরে—
দেখা দেবেন প্রাণের মাঝে আপনারেও ভুলে।
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বীণা তব শুনি মোর পরাণ চাহে
যেতে ধেয়ে তব চরণে হে।
রাখে কেবা বাঁধি মোরে
আজি মধু রাতে কঠিন শত বাঁধনে হে ॥

মিশ্র রামকেলী—তাল ফেরতা।

জাগো সবে জাগো আজি পুণ্য দিনে
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে ॥
পুষ্প ফোটে পাখী জাগে
ছুটে চলি' সবার আগে—
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে ॥
সুমঙ্গল শঙ্খ বাজে,
দিকে দিকে ঘণ্টা বাজে ;—
যেথা যে যা, সবে চলি'
তাঁরি জয়ধ্বনি করি'
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে ॥
রাঙ্গাইয়া গগন-থালে
উঠছে ভানু তালে তালে—
মন আর যে রইতে নারে
ঘরের কোণের আঁধারে।
এমন মধুর সকাল-বেলা
কোরোনাকো অবহেলা ;—
গীতে গন্ধে সবার মাঝে
প্রাণের দেবতা দেখবে রাজে
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে ॥

আশাবরী—তেতালা।

তব চরণকমলে মম মনভ্রমর
আজি প্রাতে ধায় হর্ষে বিভোর।
দিব তোমারে কিছু নাহি গো ;
নিয়েছ সব হরি' মোর ॥
হাসে চারি দিশি ফুল পাতা
গগনে উথলে আনন্দ-ঝোর।
ভিক্ষা পদে তব—রাখ বাঁধিয়া দেবা
দিয়া প্রেমের ডোর।

মনুষ্যত্বের বিকাশে প্রকৃত শিক্ষা।*

(শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত, বি-এল)

শিক্ষার স্বরূপ কি ইহা স্থির করিতে হইলে স্বতঃই মনে হয় যে মানুষ হইবার চেষ্টাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলিলেই ইহার সদুত্তর হইবে। একথাটা যে খুব সরল স্বাভাবিক এবং মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে সন্দিহান হইবার কারণ দেখা যায় না। যদি মানুষ হওয়াটা কি এবং মনুষ্যত্ব কি এ বিষয়ে আমরা একমত হইতাম বা হইতে পারি, তাহা হইলে শিক্ষার স্বরূপ কি তাহা লইয়া আর বেশী মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয় না।

অতএব আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিতে হইলে মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে সেই বিষয়ের আলোচনাই প্রথমে উঠিয়া পড়ে। আবার এবিষয়ের মীমাংসা করিতে যাইলেই সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা অবশ্যম্ভাবী। এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মানুষের স্থান কোথায় এবং তাহার সৃষ্টিতে কোন উদ্দেশ্য আছে কি না ইত্যাদি গুরুতর সমস্যা স্বতঃই মনে উদিত হয়। সৃষ্টির এবং স্রষ্টার সম্বন্ধ, অদৃষ্টবাদ (predestination) এবং ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা (freedom of will), একত্ব (individualism) এবং সমাজতত্ত্ব (collectivism) প্রভৃতি গভীর ও গুরুতর তত্ত্বের আলোচনা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

এসব তত্ত্বের সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা হয় নাই বা আশু হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কি আমরা হতাশ হইয়া আমাদের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিব? আমরা অন্যান্য বিষয়ে যতই ভিন্ন মতাবলম্বী হই না কেন, সকল ব্যাপারে উদ্যম ও চেষ্টা যে মনুষ্যত্বের একটা প্রধান লক্ষণ তদ্বিষয়ে বোধ হয় আমরা সকলেই একমত।

সেই উদ্যম ও চেষ্টার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আমাদের নিজ নিজ জ্ঞান বিশ্বাস মতে এই সকল গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করতঃ শিক্ষার স্বরূপ নির্ণয় পূর্ব্বক তাহার প্রচলনে বিধিমত চেষ্টা করা নিতান্তপ্রয়োজন বলিয়াই আমি এই দুরূহ বিষয়ের আলোচনা করিতে সাহসী হইয়াছি। এই দুঃসাহসের ফলে যে বহুতর ত্রুটী ও ভুল হইবে তাহা নিজে বেশ বুঝি বলিয়াই পূর্ব্বাহ্নে "ক্ষন্তব্যো মে অপরাধঃ"—প্রার্থনা জানাইতেছি।

সকল তত্ত্বের সুমীমাংসা সম্ভব না হইলেও বোধ হয় গোটাকতক মূলতত্ত্বে আমরা একমত হইতে পারি, এই ধারণায় সেই কয়টী তত্ত্বের উল্লেখ করিলে হয় ত আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত সহজ হইবে এই বিবেচনা করিয়া সেইগুলির উল্লেখ করিতেছি।

গোঁড়া ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্যতীত ক্রমবিকাশতত্ত্ব (Evolution Theory) সম্বন্ধে আর কেহ সন্দিহান আছেন বলিয়া মনে হয় না। সেই জন্য সৃষ্টিতত্ত্বের উহা যে একটী মূল স্তম্ভ ইহা স্বীকার করিয়াই এই আলোচনার প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহা সত্য হইলে ক্রমবিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত মানবের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার বিধান হওয়া আবশ্যক। ইহাকেই আমাদের শাস্ত্রকারেরা অধিকারভেদ বলিয়া স্বীকার করতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমার মনে হয় যে ইহা স্বীকার না করিয়া সকল লোককে একছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করাতেই আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি এত ব্যর্থ হইতেছে।

অতএব প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইলে এই তথ্যটীর উপর সদা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এখন কথা উঠিতে পারে যে যদি তাহাই হয় তবে হয় ত প্রত্যেক মানবের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক হইবে। ইহা কতকপরিমাণে সত্য হইলেও এবং মানবের নিজস্বকে ফুটান শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও একটা সাধারণ ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে করি। কারণ মানুষ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও মনুষ্যত্ব এক।

অতএব সেই জন্যই আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা করিতে যাইয়া সকলের পক্ষে একটা সাধারণ শিক্ষার স্থান রাখিয়া প্রত্যেকের বিশেষত্ব ফুটাইবার চেষ্টাকেই প্রকৃত শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি।

এক্ষণে শিক্ষার সাধারণ ব্যবস্থা করিতে যাইলেই মনুষ্যত্ব কি ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই সৃষ্টিতত্ত্বের কথা উঠিয়া পড়িবে ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয় যদি স্থিরভাবে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে মূলতঃ দুইটী শক্তির লীলাতেই এই সৃষ্টির বিকাশ। একটী আকর্ষণ, একটী বিকর্ষণ; একটী উৎকেন্দ্রিক (centrifugal). অন্যটী কেন্দ্রাভিমুখী (centripetal); একটী স্থিত (static), অন্যটী বেগবতী (dynamic)।

যুগে যুগে মানবসন্তান এই শক্তিদ্বয়কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে, এবং কখনও দেবাসুররূপে, কখনও God ও Satan রূপে, কখনও spirit ও matter রূপে, কখনও এক ও বহুরূপে, কখনও সুমতি ও কুমতি-

* লেখক শিক্ষাসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ অনেক তত্ত্ব এই প্রবন্ধে দেখিতে পাইব বলিয়া আমরা ইহা সাদরে প্রকাশ করিলাম। বলা বাহুল্য অনেক বিষয়ে বিশেষত তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক মতের সহিত আমাদের সর্ব্বাংশে ঐক্য হইবে না। সুতরাং আমরা এই প্রবন্ধোক্ত মতামতের জন্য দায়ী নহি—লেখকই দায়ী। ভঃ সং

রূপে, কখনও সংযম ও চাঞ্চল্যরূপে, কখনও বা আদর্শ (ideal) ও বাস্তব (real)রূপে এই শক্তিদ্বয়কে অভিহিত করিয়াছে। শ্রীভগবান গীতায় "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥" বলিয়া এই দুইটী শক্তির প্রকৃতি নিরূপণ করিয়াছেন।

এই দুইটী শক্তির তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ এই দুইটী শক্তির সামঞ্জস্যেই (equilibrium) সৃষ্টির বিকাশ। সেই জন্যই "রাধাকৃষ্ণ-বিকৃতি-প্রণয়-হ্লাদিনী-শক্তিরস্মাদেকাত্মনাবাপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ" রূপে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের বিকাশ। সেই জন্যই আমাদের বিশ্বপ্রসবিনী জগন্মাতা একাধারে অসিখড়্গধারিণী এবং বরাভয়দায়িনী। সেই জন্যই বুদ্ধদেবের মধ্যপন্থা আবিষ্কার। কারণ এই মিলনেই, এই সামঞ্জস্যেই সচ্চিদানন্দের বিলাস। ইহা যদি গ্রহণীয় হয় তাহা হইলে যখন বা যেস্থানে একটী শক্তির অত্যধিক প্রাবল্য হয়, সেই কালে ও সেই স্থানে অপর শক্তিটীর আশ্রয় ভিন্ন সচ্চিদানন্দের বিলাস প্রকট হয় না। এমতাবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ কি ইহা নিরূপণ না করিয়া প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় না।

সেই জন্যই প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ব্যবস্থার সময় শিক্ষার্থীর অধিকার ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণের এত প্রবল চেষ্টা এবং শিক্ষার্থীর পক্ষে আত্মনিরূপণের এত প্রবল উদ্যমের ব্যবস্থা উপলক্ষিত হয়। সেই জন্যই প্রাচীন ভারতের সাধনায় আত্মতত্ত্ব নিরূপণের এত উচ্চস্থান। গ্রীসের সাধনাতেও "To know thyself is the highest wisdom" বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

এই আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করতঃ বিদ্যাতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া শিবতত্ত্বে উপনীত হইবার জন্যই দৈনিক সন্ধ্যা-আহ্নিক হিন্দুর পক্ষে এক সুন্দর ব্যবস্থা দেখা যায়।

এস্থলেও আবার সেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি সকলের এইরূপ পৃথক পৃথক শিক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয় হয় তাহা হইলে সাধারণ ব্যবস্থার স্থান কোথায়? পূর্ব্বে ইহার যে উত্তর দিয়াছি তদ্ব্যতীত ইহার আর একটী সদুত্তর আছে বলিয়া মনে হয়। যদি আমরা সত্য সত্যই আত্মতত্ত্বনিরূপণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই এবং কেবল 'আত্মতত্ত্বায় নমঃ' বলিয়াই কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে না করি, তাহা হইলে এই স্থূল দেহাত্মবোধ হইতে ক্রমে ক্রমে বিরাট পুরুষের আত্মবোধ স্ফূরিত হইবে এবং সেই স্ফুরণের চেষ্টাই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইবে। এই সাধনায় ব্যাপৃত হইলে মানব ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর, ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর, সামান্য হইতে মহত্তর সত্তায় উপনীত হইয়া ভগবদুদ্দেশ্য সাধন করিবে। আমার সামান্য বুদ্ধিতে ইহাকেই প্রকৃত আত্মস্ফুরণ এবং এই আত্মস্ফুরণের চেষ্টাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া মনে হয়। ইহার ভিতর একত্বের বহুবিকাশ এবং অবশেষে একত্বে প্রত্যাবর্ত্তন দেখিয়া ভক্তিগদ্গদচিত্তে সেই একের শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি এবং সেই "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥" যিনি—"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥" বলিয়া নিজেকে স্বীকার করিয়াছেন এবং যাঁহাতেই এই দুটী শক্তির সমন্বয় তাঁহার পাদপদ্মে "নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর" বলিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হই।

আমাদের শাস্ত্রে "একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" এই সূত্রেই সৃষ্টিতত্ত্বের সুন্দর মীমাংসা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়াই এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্রতার মধ্যে একত্বকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করি। এই একই, পূর্ব্বকথিত দুইটী শক্তিতে বিভক্ত হইয়া অসংখ্যরূপ ধারণ করিয়া সচ্চিদানন্দের লীলা প্রকট করিতেছেন। অতএব আমরা প্রত্যেকে সেই লীলায় নিজ নিজ অস্তিত্ব অনুভব করিয়াও তাঁহার বিরাট অস্তিত্বের অঙ্গীভূত ইহা উপলব্ধি করতঃ তাঁহারই আনন্দবর্দ্ধন করিতেছি, এই অনুভূতিতে যে পরমানন্দ তাহা পাইবার প্রয়াসকেই আমি প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া মনে করি।

এই আত্মচেষ্টা ও আত্মনিবেদন শ্রীমদ্ভাগবতে কি সুন্দরভাবে প্রকটিত হইয়াছে তাহা এই শ্লোকটীর দ্বারা বুঝিতে পারিবেন বলিয়াই উহা এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

নাতঃপরং পরম! যদ্ভবত স্বরূপ
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥

আমার মনে হয় যে বহুত্বের এই বিচিত্র সার্থকতা নষ্ট না করিয়া ভূমানন্দ ভোগ করাই মানবের পূর্ণ চরিতার্থতা। জীবাত্মায় পরমাত্মার এই আভাস পাওয়াই মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ।

এই বিশেষত্ব ও সামান্যতা সম্যকভাবে রক্ষা করিয়া মানবের যাবতীয় চিত্তবৃত্তির সম্যক্ পরিস্ফুরণে এবং সামঞ্জস্যে শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলে মানবসভ্যতা রক্ষা পাইবে, নচেৎ নহে। সকল বৃত্তিই ঈশ্বরমুখী করা ব্যতীত এই পরিস্ফুরণ ও সামঞ্জস্য সম্ভব হয় না, ইহাই কেবলমাত্র জগতের সকল ধর্ম্মবেত্তা ও ঋষি-

মানবের নির্দ্দেশ। ইহা বুঝিয়া সমস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিত হইবে—ইহাই আমার সুচিন্তিত অভিমত।

এই বিশেষত্ব ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন সত্য, মানব-সঙ্ঘ বা জাতিবিশেষের পক্ষেও তেমনি সত্য। যথা :—ইংরাজজাতির বিশেষত্ব তাহাদের "Rule Britannia, Rule the waves" পদ্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এমন ইংরেজ নাই যাহার ধমনীতে এই পদ্য শুনিয়া প্রবল-তরবেগে রক্ত প্রবাহিত না হয়। কিন্তু ইংরাজ জাতির এই বিশেষত্বকে তাহারা সামান্যের অঙ্গীভূত করিতে পারে নাই বলিয়াই তাহারা জগতে সুখশান্তি আনিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের বিশেষত্ব যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে তিতিক্ষা, সংযম, সংরক্ষণই ইহার মজ্জাগত। ইহা শুনিয়াই হয় ত আমার নব্যসম্প্রদায়ভুক্ত বন্ধুগণ আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু তাঁহাদের সন্তোষ-বিধানার্থ আমায় বলিতে হইবে যে ভারতের ইহা বিশিষ্টত্ব বলিয়াই যে প্রবৃত্তির উদ্দাম নৃত্যের এখানে স্থান থাকিবে না এমত নহে। স্তর হিসাবে প্রকৃতির উদ্দাম নৃত্যকে অবসর দিতে হইবে বই কি! কাহার সাধ্য ইহার গতি-প্রতিরোধ করে? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়া গিয়াছেন—'প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি,' কিন্তু তাহা যে নিম্নস্তরের ইহা সদা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। আর একটী ইহার সুমীমাংসা ভারতবর্ষ যেভাবে করিয়াছে সেভাবে অন্যত্র কোথাও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

যদি প্রবৃত্তির উদ্দাম নৃত্য ভগবদুদ্দেশ্যেই করিতে পারা যায় তাহা হইলে তাহার স্থান অতীব উচ্চে। যখন নিজের ক্ষুদ্র সত্তার আনন্দই প্রকৃত আনন্দ নহে, উহা অপেক্ষা বৃহত্তর ও মহত্তর আনন্দের আমরা অধিকারী, ইহা বুঝিয়া সেই আনন্দ পাইবার জন্যই উদ্দাম নৃত্য করিতে শিখি, যদি বুঝি আত্মপ্রীতি কাম ও ভগবৎপ্রীতি প্রেম, তাহা হইলে দুই শক্তির সামঞ্জস্য দ্বন্দ্ববিমুক্ত হইয়া ভারতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা অনেক স্থলেই "Greatest hapiness of the largest number for longest time"এর অধিক উঠিতে পারে নাই। সম্যক্ জ্ঞান ও সর্ব্বের মঙ্গল মানুষের সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জনীয় ও করণীয় ইহা ভারতের সভ্যতাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে সাধনার ক্ষীণ স্পন্দন প্রায় প্রাণহীনদেহে এখনও পাওয়া যাইতে পারে। তাহাকে শক্তিশালী করিয়া আবশ্যক হইলে আধারের সংস্কার সাধন করতঃ জগতে সুখশান্তি আনিবার জন্য ভগবান এই বিধ্বস্ত জাতিকে এখনও সমূলে বিনাশ করেন নাই। যদি আমরা পাশ্চাত্য সাধনাকে ঈশ্বর-মুখী করাইতে পারি তাহা হইলে তাহাদের এই বিস্ময়কর জ্ঞানার্জ্জন ও কর্ম্মপ্রবণতা সার্থক ও শুভ হইবে এবং আমরা যদি "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" বুঝিয়া সকল জ্ঞান অর্জ্জন করাই তাঁহার পূজা এবং সকল কর্ম্মই তদুদ্দেশ্যে সাধিত হইলে তাঁহারই সেবা ইহা বুঝিয়া সর্ব্বজ্ঞানার্জ্জন ও সকল কর্ম্ম করিতে থাকি, তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং ভারতের সাধনার বিস্তার করিতে পারিব।

আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা। *

[সমালোচনা]

(রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল)

ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম (Aryan Culture) বহুকাল হইতে নানা কারণে সবিশেষ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। এই সব কারণের মধ্যে পরধর্ম্ম-সংমিশ্রণই সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট। অনেক সময়ে পরধর্ম্ম হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত আর্য্যধর্ম্মকে কমঠবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যুগের পর যুগ কাটাইতে হইয়াছে। এখনও রক্ষণশীলেরা সেই কমঠ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই থাকিতে চাহেন এবং তদুদ্দেশ্যে উপদেশ করেন। একদিকে পরধর্ম্ম-সংমিশ্রণ এবং অপর দিকে বহুকাল ধরিয়া গতিহীন, উন্নতিহীন অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ক্রমে জীবনীশক্তির হ্রাস—এই উভয়ের ফলে আর্য্যধর্ম্মে বিষম ও বিজাতীয় গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। আমি এস্থলে "ধর্ম্ম" শব্দ ইংরেজী "religion" শব্দের অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। ইংরেজী Culture শব্দে যাহা বুঝায়, সেই ব্যাপক অর্থেই "ধর্ম্ম" শব্দ ব্যবহার করিতেছি। বস্তুতঃ হিন্দুর ধর্ম্মও তাই—শুধু পূজা, উপাসনাদি নহে; উহার সহিত রীতি-নীতি, ভাব-ভঙ্গি, শিক্ষা-দীক্ষা, আহার-বিহার ইত্যাদি জীবন-যাত্রার যাবতীয় ক্রিয়াসমষ্টির আদর্শই হিন্দুর "ধর্ম্ম" নামে অভিহিত।

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে ও প্রভাবে হিন্দুর ধর্ম্ম বিষম ভাবে বিপর্য্যস্ত হইতেছে। এই যুগের আরম্ভ হইতেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণের কুফল ফলিতে থাকে। এই কুফল দেখিয়া যাঁহারা আর্য্যধর্ম্ম সংরক্ষণের প্রয়াসী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। যে স্রোত নিবারণের জন্য তাঁহার এই প্রশংসনীয় প্রয়াস, সে স্রোত কিন্তু ক্রমেই প্রবলতর রূপে প্রবহমান। তাই সুদীর্ঘকাল

---

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ৪১৫পৃষ্ঠা। কাগজ ছাপা ও বাঁধাই উত্তম। মূল্য এক টাকা বারো আনা মাত্র।

পরে তিনি ঐ গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থখানি আগাগোড়া পড়িয়া দেখিলে সহৃদয় পাঠক বুঝিবেন যে, গ্রন্থকার হিন্দু স্ত্রীলোকের পক্ষে পাশ্চাত্য অনুকরণকে সর্ব্বাংশে মাতৃত্বের প্রতিকূল জ্ঞান করেন। পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষা ও স্বাধীনতা কোন মতেই হিন্দু আদর্শানুযায়ী গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুকূল নহে।

হিন্দুর গার্হস্থ্যধর্ম্ম শ্রেষ্ঠধর্ম্ম এবং গার্হস্থ্যাশ্রম শ্রেষ্ঠ আশ্রম। "Complete living" এই গার্হস্থ্য আশ্রমের আদর্শ এবং ঐ আশ্রমে থাকিয়া জীবনকে ঐ আদর্শানুযায়ী করাই পূর্ণ মানবতা প্রাপ্তির উপায়। এই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়াই গার্হস্থ্যধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন কর্ত্তব্য এবং একটা সূত্র (principle) ধরিয়া তাহা করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাতৃত্বই গার্হস্থ্যধর্ম্মের সূত্র। যে কার্য্য মাতৃত্বের অনুকূল, গৃহিণীর পক্ষে তাহাই সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয় এবং যে কার্য্য মাতৃত্বের প্রতিকূল, তাহাই সাবধানে বর্জ্জনীয়। এই সূত্র ধরিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রচলিত "পাশ"-কারিণী স্ত্রীশিক্ষা (অবশ্য উচ্চশিক্ষা) মাতৃত্বের অর্থাৎ গার্হস্থ্য ধর্ম্মসাধনের অনুকূল নহে;—বস্তুতঃ অনেকাংশে প্রতিকূল। হিন্দু স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রসম্মতই হওয়া চাই। নতুবা কেবলমাত্র পাশ্চাত্য মতে উচ্চশিক্ষিতা হিন্দু গৃহিণীর পক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম্মের আদর্শ রক্ষা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও হয়।

স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অপেক্ষা নিজ নিজ ব্যক্তিত্বকেই বড় করিয়া দেখিতেছে। সুতরাং পাশ্চাত্য স্ত্রীলোক ব্যক্তিগত ভাবেই শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যস্ত। তাঁহাদের লক্ষ্য, শিক্ষা ও স্বাধীনতা দ্বারা নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটনের দিকে। এই ব্যক্তিত্ব বস্তুটাকে হিন্দু অন্যভাবে দেখিয়াছে এবং আমার মনে হয়, তাহাই বৈজ্ঞানিক। সামাজিক জীবের সহিত সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সমাজকে বাদ দিয়া "ব্যক্তি" দাঁড়াইতে পারে না। কেবলমাত্র পুরুষ বা কেবলমাত্র স্ত্রী যতই কেন ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ লাভ করুন না, পূর্ণ ব্যক্তিত্ব লাভের অধিকারী বা অধিকারিণী নহেন; কারণ, জীবপ্রবাহ, তথা সমাজ, রক্ষা করিতে তাঁহাদের উভয়ের সম্মিলন ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। এই সম্মিলন উদ্দেশ্যেই সভ্য জাতিদের মধ্যে 'বিবাহ'-অনুষ্ঠান। স্বামী-স্ত্রীর এই সম্মিলন যত গাঢ় ও যত দৃঢ় হইবে, ততই গৃহের মঙ্গল এবং গৃহের মঙ্গলেই প্রত্যক্ষভাবে সন্তানের এবং পরোক্ষভাবে সমাজের মঙ্গল। হিন্দুর পক্ষে এই সম্মিলিত স্ত্রীপুরুষই সমাজের unit অর্থাৎ একক। বিবাহমন্ত্রের

"যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

এই যে স্ত্রীর স্বীকৃতিবাক্য, ইহা শুধু বিবাহকার্য্যটী কোন প্রকারে সমাধা করিবার জন্য একটা কৌশলাত্মক স্তুতিবাক্য নহে; ইহা আজীবন উভয় হৃদয়ের একীকরণ করিবার উপদেশ। গার্হস্থ্যধর্ম্মের মূল কথাই ঐ, অর্থাৎ দুই হৃদয় এক করিয়া গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিতে হইবে।

গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সতীত্বধর্ম্ম বা দাম্পত্য-প্রেমই সকল প্রকার প্রেমের মূল। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি প্রথমে গৃহে অঙ্কুরিত হয়; এবং ক্রমে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্বসমাজ ও স্বদেশ আলিঙ্গন করিয়া অবশেষে জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। এই দাম্পত্য প্রেমের উৎকর্ষেই সন্তানের উৎকর্ষ ও গৃহের উৎকর্ষ। সুতরাং সমাজের উৎকর্ষের মূলও উহাই। এই প্রেম নষ্ট কর, দেখিবে গৃহ থাকিবে না—সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। গৃহ না থাকিলে, সমাজ কোথায় থাকে? কোন্ ইতিহাসাতীত যুগে যে দিন মানুষ গৃহ বাঁধিয়া তাহাতে গৃহিণী স্থাপনা করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া মানবহৃদয়ের এই প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হয়। তারপর, যুগযুগান্তরের লালনপালনে বদ্ধমূল ও বর্দ্ধিত হইয়া এবং শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হইয়া নানাভাবে ও নানা আকারে উহা এখন সমাজব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্নেহ বলো, ভক্তি বলো, প্রীতি বলো, মৈত্রী বলো—সকল সামাজিক ধর্ম্মের মূলই ঐ। গৃহে ইহার জন্ম, সমাজে ইহার ব্যাপ্তি এবং পরিশেষে পরম প্রেমময়ের পাদমূলে ইহার চরম পরিসমাপ্তি। যে বিশ্বপ্রেম পূর্ণ মানবতার আদর্শ, গার্হস্থ্যধর্ম্মেই তাহার দীক্ষা, সমাজধর্ম্মেই তাহার সাধনা এবং দেবত্বলাভেই তাহার সিদ্ধি। তাই বলিয়াছি—complete living বা পূর্ণ মানবতাসাধনের অনুকূল ক্ষেত্র আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত গার্হস্থ্যাশ্রম।

হিন্দু নারীর শিক্ষা, সাধনা ও স্বাধীনতা—সবই এই গার্হস্থ্যাশ্রমের অনুকূল হওয়া চাই। এবং তাহা তখনই সম্ভব, যখন স্ত্রীর কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্র হইবে মাতৃত্ব। মাতৃত্বকে গার্হস্থ্যধর্ম্মসাধনার কেন্দ্র করিলে স্বতঃসিদ্ধভাবে পত্নীকে সত্যানুসারিণী হইতে হইবে—বাধ্য হইয়া নহে, স্বেচ্ছায়। এই সত্যানুসারিণী মনোবৃত্তিই গার্হস্থ্যধর্ম্মের অনুকূল। ইহার অন্যথায় অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারে গার্হস্থ্যধর্ম্ম বিধ্বস্ত হয়। যাঁহারা পাশ্চাত্যদেশের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের কাছে এ কথা অবিদিত নহে। তবু কিন্তু স্ত্রীশিক্ষায় ও স্ত্রীস্বাধীনতায় পাশ্চাত্যের অনুকরণই এদেশে উদ্যম সহকারে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফল যাহা হইবে, তাহা অনুমেয়। ফলের কিছু কিছু নিদর্শন

যাঁহারা চক্ষুষ্মান, তাঁহারা এখনই না দেখিতেছেন এমন নয়। গ্রন্থকার বলিতেছেন—Beware—সাবধান—ও পথে যাইও না। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতাকে মাতৃত্ব-মুখিনী কর। স্ত্রীশিক্ষাকে পূর্ণমাত্রায় গার্হস্থ্যধর্ম্মানুসারিণী কর; আর স্ত্রীস্বাধীনতাকে পত্যনুসারিণী কর। ঐরূপ স্বাধীনতায় অবরোধক্লেশ বিদূরিত হইবে, অথচ মাতৃত্ব-বোধ ক্ষুণ্ণ হইবে না।

গার্হস্থ্যধর্ম্মে কি স্ত্রী, কি পুরুষ কাহারই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্থান নাই। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া উভয়ের যতখানি স্বাধীনতা গার্হস্থ্যধর্ম্মের অনুকূল, তাহাই মঙ্গল-কর। বলা বাহুল্য, গার্হস্থ্যধর্ম্মে পুরুষের স্বাধীনতাও অবাধ নহে—তাহাও পিতৃত্বের (তথা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের) অনুকূল হওয়া চাই। গৃহস্বামী ও গৃহিণী, উভয়েরই এই একই লক্ষ্য থাকিলে, দাম্পত্য প্রেমের প্রভাবে পরস্পর পরস্পরের অধীন, এ মনোভাব বিদূরিত হইয়া উভয়ের কার্য্য উভয়ের প্রীতি অর্জ্জনই করিয়া থাকে। তখন আর "স্বাতন্ত্র্য" নাই বলিয়া মনঃক্ষোভ থাকে না। বরং গার্হস্থ্য মঙ্গলের দিকে উভয়ের লক্ষ্য থাকিলে স্বামীতন্ত্রতাকেই স্ত্রী সৌভাগ্য জ্ঞান করেন। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" মনুর এই আদর্শ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বচনটী পাশ্চাত্য মতে আপত্তিজনক;—কারণ, পাশ্চাত্য মতে স্ত্রীও যেমন এক "ব্যক্তি", স্বামীও তেমনই এক "ব্যক্তি"। সুতরাং এ অবস্থায় কেহ কাহারও অধীন হওয়া মনুষ্যত্বের বিরোধী বলিয়া ভাবাই স্বাভাবিক। হিন্দুর গার্হস্থ্য ধর্ম্মে স্বামী ও স্ত্রী মিলিতভাবে সমাজের এক ব্যক্তি; সুতরাং তাহা অবিভাজ্য—"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য-মর্হতি"। উভয়ের স্বীয় স্বীয় "স্বাতন্ত্র্য" ধর্ম্মের প্রতিকূল। যে সমাজেই গার্হস্থ্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর "স্বাতন্ত্র্য", সেই খানেই তাঁহারা নামে মাত্র গৃহী ও গৃহিণী,—কার্য্যে নহে। পাশ্চাত্য দেশে এখন স্বামী-স্ত্রীর এই ব্যক্তিগত ভাবের প্রভাব এবং পাশ্চাত্যদেশের নব্য সাহিত্যও এই ভাবের পোষকতা করিতেছে। গৃহস্থধর্ম্মের দিক্ দিয়া স্বামী ও স্ত্রীকে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি ভাবিলেই তাহার ফল গার্হস্থ্য ধর্ম্মের নাশ। পাশ্চাত্যের অনুকরণে ও আধুনিক ধর্ম্মবিবর্জ্জিত শিক্ষার প্রভাবে স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত এই স্বাতন্ত্র্যের ভাব এদেশেও দেখা যাইতেছে এবং তাহার ফল সুমধুর বলিয়াও বোধ হইতেছে না। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—হিন্দুনারীর শিক্ষা ও স্বাধী-নতাকে মাতৃত্বমুখিনী কর। ক্ষিতীন্দ্রনাথ যে হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে সবিশেষ ভক্তিমান্, এ গ্রন্থের পত্রে পত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্রে যেখানে দ্বিবিধ পন্থা উল্লিখিত, সেখানে তিনি যে পন্থা উপস্থিত যুগধর্ম্মের অনুকূল, তাহা গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছেন। কালধর্ম্মে এখন কন্যার বিবাহ পরিণত বয়সে হইতেছে এবং হইবে। তিনি দেখাইয়াছেন যে মন্বাদি শাস্ত্রও তাহার বিরোধী নয়। যুগধর্ম্মের প্রতিকূলে "অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী" এই বিধান এখন আর কেহই মানিবে না। এখন শিক্ষিতেরা বুঝিয়াছেন যে, পরিণত বয়সে বিবাহে বিধবার সংখ্যা হ্রাস, জননী ও সন্তান উভয়ের মঙ্গল ইত্যাদি নানা বিষয়ে শুভকর। এবং যদি পরিণত বয়সে বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধও না হয়, তাহা হইলে এ যুগে তাহাই বিধেয়।

গ্রন্থকার উপসংহার করিয়াছেন, "বেদ অবধি তন্ত্র পুরাণ পর্য্যন্ত কোন প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থেই স্ত্রীলোকের বেদাদি পঠন-পাঠন বিষয়ক নিষেধ-বিধি নাই। দ্বিতী-য়তঃ, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী এবং পাশ্চাত্য স্বাধীনতা মাতৃত্বের আদর্শরক্ষার পক্ষে, সুতরাং ভারতের হিন্দুরমণীর পক্ষে, সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তৃতীয়তঃ, মাতৃত্বকেন্দ্রক স্ত্রীশিক্ষা ও বৈদিক কালের স্ত্রীস্বাধীনতা অথবা প্রকৃত অবরোধপ্রথাবিষয়ক শাস্ত্রানুশাসন ও শাস্ত্রসমর্থিত সামা-জিক আচার-ব্যবহার নিষ্কলঙ্ক সতীত্বরক্ষার পক্ষে সুতরাং হিন্দুরমণীর সম্পূর্ণ উপযোগী।"

গ্রন্থকার হিন্দুর এই মহাসঙ্কটকাল সমুপস্থিত বুঝিয়া আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশ বিবৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক হিন্দুর পক্ষে মহা সমস্যা উপস্থিত। সকল দিক্ দিয়া হিন্দুর সমাজ, আচার, ব্যবহার—এক কথায় হিন্দুর ধর্ম্ম (culture) ধ্বংসমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। এ সমস্যা এখন মরণ-বাঁচনের সমস্যা। হিন্দু culture হারাইয়া বাঁচা অপেক্ষা হিন্দুর পক্ষে মরণই শ্রেয়ঃ। শাস্ত্রের উপদেশ—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" আর যদি বাঁচিতেই হয়, তাহা হইলে হিন্দুভাবে উপস্থিত অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। নতুবা পরিবর্ত্তনের বিরোধী দুই-চারিটা শ্লোক উচ্চারণে এ ভীষণ স্রোত নিবারিত হইবে না। রক্ষণশীলেরাও জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এ স্রোতে ঠিক আত্ম-রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। ভগবদ্বাণী আছে সত্য—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে কমঠবৃত্তি অবলম্বনে যুগের পর যুগ কাটাইয়া দেওয়া সজীবতার লক্ষণ নহে। আর্য্যধর্ম্ম সনাতন হইলেও, তাহা পালন না করিয়াও হিন্দুজাতি সনাতন, মরণের অতীত, এই ভাবিয়া বসিয়া থাকা শাস্ত্রসঙ্গত কি না বলিতে পারি না; কিন্তু যুক্তি-সঙ্গত নয় বলিয়াই বোধ হয়। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু-জাতির হিতকামী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে যতই আলোচনা করেন, ততই মঙ্গল। ক্ষিতীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অনেক

ভাবিয়াছেন ও গবেষণা করিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদার্হ। আরও দশ জন এ বিষয়ে চিন্তা করুন, গন্তব্য পথের নির্দ্দেশ করুন, ইহাই আমার কামনা।

নানা কথা।

মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমকথা—সংবাদপত্রে দেখি, মহাত্মা গান্ধী বলেন যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রম "উদ্যোগ মন্দিরে" ঠিক তাঁহার মনের মত কাজকর্ম্ম চলিতেছে না এবং তাহার অন্যতর দৃষ্টান্ত-স্বরূপে তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিণীর কয়েক মুদ্রা আশ্রমনিয়মের বিরুদ্ধে নিজের নিকট সঞ্চিত রাখিবার কথা তাঁহার নিজের সংবাদপত্রের সাহায্যে জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিয়া পত্নীর নামে চৌর্য্যাপবাদ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অপর সাধারণ কোন ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করিলে আমরা তাহাকে শত ধিক্কার দিতাম। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী, যাঁহাকে ইউরোপ আমেরিকা বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তিনি যখন নিজের স্ত্রীর নামে ঐরূপ নিন্দা ঘোষণা করিতেছেন, তখন সে বিষয়ে আমাদের মত ক্ষীণবুদ্ধি সাধারণ ব্যক্তির কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু তথাপি আমাদের মনে যে দুই চারি কথা উদিত হইতেছে তাহাও তো না বলিয়া পারি না। প্রথম কথা আমাদের মনে হয় এই যে, বিচারালয়ের নিয়ম এই যে, কাহাকেও বিচারার্থ উপস্থিত করিলে আসামীকে নিজের দোষক্ষালনের জন্য অবসর ও সুযোগ দেওয়া হয়। যেস্থলে সেরূপ সুযোগ না দিয়া দণ্ড দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে বিচার বিচার নহে, বিচারের প্রহসন মাত্র। মহাত্মা গান্ধীর কর্ত্তব্য ছিল, তাঁহার পত্নীকে আত্মদোষ ক্ষালনের অবসর দেওয়া। তিনি যখন পত্নীর নামে চোর অপবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, এবং সেকথা সাধারণ্যে ঘোষণা করিতেও বিরত হন নাই, তখন তাঁহার পত্নীকে এবিষয়ের কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাও প্রকাশ করা উচিত ছিল। তবেই আমরা ধর্ম্ম রক্ষিত হইল বলিতে পারিতাম। কিন্তু তিনি যখন এবিষয়ে তাঁহার পত্নীর কৈফিয়ৎ লয়েন নাই মনে হইতেছে, লইয়া থাকিলেও সাধারণ্যে প্রকাশ করেন নাই, অথবা তাঁহার কোপের নিকট পত্নী কুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছেন বা স্বামীর উপর কোনও কথা না কহিবার হিন্দুমহিলার অধিকারের কারণে হয় তো কৈফিয়ৎ দেন নাই, তখন আমরা শতবার বলিব, মহাত্মা গান্ধীর উচিত ছিল, তাঁহার পত্নীর ভ্রম হইয়া থাকিলে ভ্রম বুঝাইয়া দেওয়া এবং আশ্রমের প্রাপ্য কোন টাকা নিজের কাছে রাখিয়া থাকিলে তাহা ফেরত দেওয়ানো। কিন্তু পত্নীর একটী কার্য্যকে চৌর্য্য নাম দিয়া তাঁহাকে অতি হেয় করিয়া দেখা এবং জগতকে হেয়রূপে দেখিতে শিক্ষা দেওয়া আমরা অত্যন্ত অন্যায় মনে করি—ইহাকে আমরা কিছুতেই ধর্ম্মানুগত বলিতে পারি না।

রামমোহন স্মৃতিস্তম্ভ—বিলাতের ব্রিষ্টল সহরে রামমোহন রায়ের যে স্মৃতিস্তম্ভ আছে, তাহা ধ্বংসের মুখে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই পাঠকদিগকে জানাইয়াছি। বিলাতপ্রবাসী যে সকল ভারতবাসী ইহার মেরামতের জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের যে সকল সভ্যের নিকট এই বিষয়ের অলোচনার জন্য প্রস্তাবটী উপস্থিত করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের কেহই রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজকে এই আলোচনায় অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। গ্রহণ করুন বা নাই করুন, আমাদের প্রিয় রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিস্তম্ভ মেরামত হইলে এবং তজ্জন্য একটা স্থায়ী ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমরা বড়ই সুখী হই। সংবাদপত্রে দেখি, মেরামত করিতে প্রায় ৫০০০৲ টাকা এবং স্থায়ী ভাণ্ডারের জন্য প্রায় ১০০০০৲ টাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দিয়াছেন—

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫০০৲; মিঃ অশোক মোহন বসু ৫০০৲; ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ২৫০৲; মিঃ নির্ম্মলেন্দু রায় ও মিঃ রাজেন্দ্রনাথ রায় ;(শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের মারফতে) ২৫০৲; মিসেস্ এম এম বসু ২০০৲; মিসেস্ ডি এন রায় ২০০৲; মিঃ অশোক চাটার্জ্জির সংগৃহীত ২০০৲; শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩১৲; মিঃ এস্ এন্ মল্লিক (প্রথম কিস্তীতে) ১০০৲; মিঃ নিশীথ-চন্দ্র সেন ১০০৲; মিসেস্ কিরণ বসু ১০০৲; মিস্ হেম-প্রভা বসু ১০০৲; শ্রীযুক্তা মাধুরী মহলানবীশের সংগৃহীত ১০০৲; লেডী জি, এম, সিংহ ১০০৲; মিঃ এস্ এন্ রায় আই সি এস্ (দিল্লী) ৫০৲; মিঃ সুরেন্দ্রমোহন বসু (প্রথম কিস্তীতে) ৫০৲; মিঃ এ সি সেন ৫০৲; রায় প্রমথনাথ বাহাদুর ৪০৲; মিঃ এস এম বসু ২৫৲; মিঃ শিশিরকুমার দত্ত ২৫৲; মিঃ শিশিরকুমার মল্লিক ২৫৲; শ্রীযুক্তা আশালতা মজুমদার ১০৲; মিসেস্ এ পি ঘোষ (প্রথম কিস্তীতে) ১০৲; মিসেস্ বিজয়চন্দ্র বসু ১০৲; মিঃ মনমোহিত ঘোষ ১০৲; মিঃ সুরেন্দ্র-নাথ দাস ১০৲; মিসেস্ বি এল চৌধুরী ৪৲; মিঃ এম এল সরকার ১৲; জনৈক অজ্ঞাতনামা ১৲; মোট ৩২০৬৲ টাকা।

যিনি এই কার্য্যের জন্য যাহা কিছু দান করিবেন তাহা শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে এবং যথাস্থানে প্রেরিত হইবে। পত্রিকায় তাঁহাদের দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

"অধঃপাতের পথে"—আমরা দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, বলিতে গেলে মহিলানৃত্য প্রভৃতির দুর্নীতিমূলক কার্য্যের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর নেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ই তাঁহার সঞ্জীবনীতে নির্ভীকহৃদয়ে আর্থিক ক্ষতিস্বীকার করিয়াও ক্রমাগত প্রতিবাদ করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাইতেছি। আমরা দুই একজন নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মমহিলাকে প্রতিষ্ঠিতস্থিতাস্থত্বেও মহিলানৃত্য সমর্থন করিতে শুনিয়াছি। হায় রে ব্রাহ্মমনোভাব! সম্প্রতি সঞ্জীবনী Greer Parkএ মহিলাদিগের জন্য মহিলা কর্ত্তৃক মূক অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন; আমরাও এই প্রতিবাদ সমর্থন করি, কারণ ইহা thin end of the wedge। এক পা সরিলেই বহির্নৃত্যে পড়িতে হয়। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ কি ভাবিয়া দেখিতেছেন যে এই সকল কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে কিরূপ পর্ব্বতসমান বিঘ্ন আনয়ন করিতেছে এবং ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠানসমস্যা কিরূপ অন্যায় প্রণালীতে দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছে? মহিলানৃত্য প্রভৃতি ভাল কি মন্দ, তাহার acid test আমরা মনে করি যে সেই সকলের অনুষ্ঠাতা তাঁহাদের মাতাদিগকে ষ্টেজে নামাইয়া নাচাইতে সম্মত আছেন কি না? মহিলানৃত্যের অনুষ্ঠাতাগণ অনেক সময়ে বলেন যে, যেমন ব্রহ্মসঙ্গীতের দ্বারা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্গীতের প্রতি অশ্রদ্ধা বিদূরিত হইয়াছে, সেইরূপ তাঁহারা ভদ্রমহিলাদের নৃত্যের সাহায্যে নৃত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা দূর করিবেন। বলিতে ইচ্ছা হয়—হায় রে হায়—কিসের সঙ্গে কি! নৃত্যের মূল নীতিই হইল দেহ সম্বন্ধ লইয়া—যতই চেষ্টা কর, নৃত্য হইতে এই সম্বন্ধ অপসারিত কিছুতেই দূর করা যাইতে পারে না, সুতরাং ইহা হইতে দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবনতিসাধক দুর্নীতির সম্ভাবনা অতিক্রম করাও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে।

হিন্দুসমাজ সম্মিলন—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে হিন্দুসমাজ সম্মিলন সম্পর্কিত প্রদর্শনী খোলা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে যতই মেলামেশা হইবে ততই সুখের বিষয়।

গ্রন্থ-পরিচয়।

বিলাত ভ্রমণ—শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅতুলচন্দ্র নন্দী, মাতৃমন্দির-কার্য্যালয়, ২০০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা মাত্র। সবুজ কাপড় ও সোনালি অক্ষরে সুন্দর বাঁধা, ডবলক্রাউন ৩০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

এই গ্রন্থটী হাতে পাইয়া মনে করিয়াছিলাম যে বিলাতের কথা তো জানাই আছে, এই গ্রন্থে নূতন এমন কি কথা লিখিত থাকিবে, যাহা আমরা পড়ি নাই বা শুনি নাই? যাই হোক গ্রন্থকার যখন সমালোচনার জন্য দিয়াছেন, তখন ভাবিলাম, একবার অন্ততঃ চক্ষু বুলাইয়া গ্রন্থখানি দেখা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া রাত্রিশেষে ভোর ৪টায় আরম্ভ করিয়া ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে পাঠ সমাপ্ত করিয়া উঠিলাম। গ্রন্থটী বড়ই ভাল লাগিয়াছে—বাহিরের আকার প্রকারও যেমন ভাল, ভিতরের লিখিবার বিষয় ও প্রণালীও তেমনি সুন্দর। গ্রন্থের সুন্দর ভূমিকা লিখিয়াছেন আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ভূমিকাতে তিনি গ্রন্থকারের এই বিলাতভ্রমণকে "বাঙ্গালীর ছেলের বিশেষরকম জয়যাত্রা" বলিয়াছেন। কারণ, গ্রন্থকার বিলাত হইতে প্রথম যাত্রাতেই প্রায় কুড়ি হাজার টাকা আদায় করিয়া দেশে আনিয়াছেন। পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ, ইউরোপে বঙ্গমহিলা প্রভৃতি অনেকেরই বিলাতভ্রমণ পড়িয়াছি, কিন্তু সেগুলির কোনটাই একজন প্রকৃত কর্ম্মীর লিখিত নহে; সেগুলি সাহিত্যিক কর্ত্তৃক sentimental দৃষ্টিতে লিখিত। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রত্যেক ঘটনা কর্ম্মীর practical দৃষ্টিতে দেখিয়া লিখিত। কাজেই ইহাতে বক্তৃতা কম, কিন্তু কাজের কথা অনেক আছে। আচার্য্য রায় ভূমিকাতে বলিয়াছেন "দেশের হাওয়া ফিরেছে এরকম বইয়ের আদর হবে"। আমাদের সন্দেহ আছে, কিন্তু আমরাও তাঁহার সঙ্গে একপ্রাণে আশা করি যে "দেশের হাওয়া ফিরুক, এরকম বইয়ের আদর হউক"।

পত্রিকাপরিচয়।

প্রকৃতি—শীতসংখ্যা—১৩৩৫—মুখপত্রেই অধ্যাপক ডাক্তার হান্স্ মলীশএর সুন্দর প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। ইনি বর্ত্তমানে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানমন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। উপযুক্ত সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয়ের হস্তে বাংলা ভাষায় ইহা বিজ্ঞানবিষয়ক standard পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের খুবই সুলক্ষণ যে, ডাঃ শ্রীসহায়রাম বসুর ন্যায় বিজ্ঞানবিৎ বৃক্ষের উপর হীরাকষ প্রভৃতি দ্রব্যের ইন্‌জেক্‌শন করিয়া ফল পরীক্ষা করিতেছেন এবং তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতেছেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ইনজেকশন শব্দের বানান

সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ইংরাজীতে যেখানে "tion" থাকে, তাহার বাংলায় প্রতিলিপি করিতে গেলে "শন" —শ-কারযুক্ত করিলে বোধ হয় ভাল হয়। "sh"এর স্থলে "ষ" করাই সঙ্গত বোধ হয়। "ইনজেকশন" শব্দের প্রতিশব্দ লেখক "অন্তর্নিক্ষেপ" করিয়াছেন। "অন্তর্বেশ" করিলে কিরূপ হয়?—"অন্তর্বিষ্ট" শব্দের বিশেষ্য ব্যবহার করিলে ভাল মনে হয়।

"তারাপরিচয়" প্রবন্ধ—দুঃখের বিষয় এটা বিশেষজ্ঞের পক্ষে উপযোগী হইলেও আমার মত জ্যোতিবিদ্যায় অজ্ঞের পক্ষে বিশেষ দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। কি ভাবে এই সকল প্রবন্ধ লিখিত হইলে সুবোধ্য হইবে, তাহারও ইঙ্গিত করা বড়ই কঠিন। কিন্তু সুবোধ্য করিয়া লিখিলে ভাল হয় এইটুকু বলিতে পারি। প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত "তারাপুঞ্জের বিবরণ" এবং "বৈদিক প্রসঙ্গ" অপেক্ষাকৃত interesting হইয়াছে, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও interesting করিয়া লিখিলে তবে সাধারণ লোকে তাহা পাঠ করিয়া আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানলাভ করিবে।

"কালিদাসের বৃক্ষলতা"র ২য় পর্য্যায় চলিতেছে। নামেতেই বক্তব্য সুস্পষ্ট। "ক"এর ঘর চলিতেছে। শেষ হইলে এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে একটা বহুমূল্য গ্রন্থ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বৃক্ষের ফুল পাতা বা শিকড় ইত্যাদির কবিরাজী এবং পাশ্চাত্য অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি মতে গুণাগুণ দিলে প্রবন্ধের উপকারিতা বৃদ্ধি পাইবে।

"রক্তের কথা" প্রবন্ধটি লেখক যথাসাধ্য সুস্পষ্ট করিয়া লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন—তবু অনেক বিষয় বাংলায় ভালরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হন নাই। ইহা লেখকের দোষে নহে, কিন্তু বাংলা ভাষা বিজ্ঞানে, বিশেষত আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া। বাঙ্গালী যদি বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে চান, তবে কতকগুলি অশ্লীল নাটকনবেল পড়িয়া সময়ের অপব্যবহার করিয়া, দেহের বল, মনের বীর্য্য ও আত্মার তেজের বৃথা ক্ষয়সাধন করিলে চলিবে না। শিক্ষিত সমাজের সমবেত চেষ্টায় বিজ্ঞানবিষয়ক পরিভাষা স্থির করিতে হইবে এবং সেই পরিভাষার সাহায্যে ভাল ভাল গ্রন্থ সকলের মর্ম্ম বা অনুবাদ প্রকাশ করিতে হইবে। নচেৎ কথায় কথায় বলা সহজ হইবে যে, বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া বিদ্যালয়ে সকল বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে, কিন্তু উপায় অভাবে যে তাহা অসম্ভব হইবে। এ বিষয়ে আমাদের জাপান প্রভৃতি দেশের অনুকরণ ও অনুসরণ করা উচিত।

"গাছের কথা" প্রবন্ধ—সুন্দর ও সহজবোধ্য।

"আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা"—উপযুক্ত ব্যক্তি এই পরিভাষা সংগ্রহে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু একটা suggestion করিতে চাই—সংস্কৃত শব্দগুলি কোন্ গ্রন্থে আছে, তাহার উল্লেখ করিলে—(যথা, ভাবপ্রকাশ হইতে হইলে ভা• প্র•) শব্দগুলি অধিকতর প্রামাণিক হয়—কোনও দ্বন্দ্ব থাকে না।

"সজীব আলোক" প্রবন্ধটী অধ্যাপক ডাঃ হানস মলীশের ইংরাজী হইতে অনুবাদ। সুলিখিত। বৃক্ষপত্র ও প্রাণীগণের শরীর প্রভৃতি হইতে আলোক দেখা যায়, তাহারই বিষয়ে এই প্রবন্ধ। সম্পাদক মহাশয় যদি আধুনিকতম বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ বিভিন্ন ভাষা হইতে অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করেন, তবে উহা দ্বারা দেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইবে।

উপসংহারে আমরা "প্রকৃতি"র দীর্ঘজীবন কামনা করি। ইহার প্রত্যেক প্রবন্ধ গুরুত্বপূর্ণ—কোন্‌টাকে ছাড়িয়া কোন্‌টাকে প্রশংসা করিব বলা বড় কঠিন।

সঞ্জীবনী—৪৭ বৎসরে পড়িয়াছে। নিজের শুভবুদ্ধি ও জ্ঞানমতে সর্ব্ববিধ পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে অদ্বিতীয়। আমরা আশীর্ব্বাদ করি, ভগবানের বিজয়পতাকাবহনে সঞ্জীবনী চিরকাল এইরূপ নির্ভীকহৃদয়ে অগ্রসর হউক।

ব্রহ্মবিদ্যা—ফাল্গুন ১৩৩৫—প্রথমেই শ্রীদ্বারকানাথ দেবের "সাধন সোপান" বিষয়ক পয়ার ছন্দে ১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী কবিতা। কবিতাকারে কঠিন বিষয়সকল বোধগম্য করাইবার চেষ্টার সময় বহুকাল হইল অতীত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ—গুরু ও শিষ্য (শ্রী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিপরিচয়)—লেখক লিখিতেছেন—"ব্রহ্মা তাঁহার চারি পুত্র সনৎকুমার, সনক, সনাতন ও সনন্দকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন"—এবিষয়ে আমরা না হয় তথাস্তু বলিয়া মানিয়া লইলাম। কিন্তু তাহার পরে বলিতেছেন—"ইহারা এক্ষণে জনলোকে অবস্থান করত আমাদের এই জগতে আধ্যাত্মবিদ্যা পরিচালনা করিতেছেন।" মন সহজেই জিজ্ঞাসা করে—প্রমাণ? যদি বল, শাস্ত্রে আছে, মন জিজ্ঞাসা করে তাহার প্রমাণ? যদি কেহ আমাকে শাস্ত্রের বা গুরুবাক্যের দোহাই দিয়া "সোনার পাথরবাটীতে" বিশ্বাস করিতে বলেন, তবে আমাকে তাহা কি বিশ্বাস করিতে হইবে? ধরিয়া লইলাম, সনৎকুমার প্রভৃতি আধ্যাত্মবিদ্যা পরিচালনা করিতেছেন—তাহাতে এল গেল কি, বুঝিতে পারি না। তাহার পর আমাদের মত স্বল্পধারণার লোক Fourth Round, Root Race, venus chain প্রভৃতি high sounding phrasesএর ধারেও যাইতে পারি না—এ অক্ষমতা স্বীকার করিতেছি। লেখক যে কেতাব reference দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়াও আমি যে তিমিরে ছিলাম,

সেই তিমিরেই আছি। লেখক বলিতেছেন—যিশুখৃষ্ট শ্রীমৎ কৃষ্ণমূর্ত্তির দেহ অবলম্বন করিয়া লোকশিক্ষা দিতেছেন এবং পরে স্বশরীরে আবির্ভূত হইবেন। এই বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানে সমুজ্জ্বল বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এসকল কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কি সত্যই মনে করেন যে সকলে এই সকল কথা বিনা বাক্যব্যয়ে গলাধঃকরণ করিবে আর সহজে পরিপাক করিবে? আমরা তো তাহা করিতে পারি না—প্রমাণাভাবাৎ—কোনও প্রকার প্রমাণ বা লক্ষণ উহার স্বপক্ষে দেখি না। একটা বিষয় কি লেখক ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, এই সকল কথা প্রচারের ফলে মানবের বিশেষত এদেশবাসীর অন্তরে মানসিক পরাধীনতার কত বড় পাষাণভার চাপাইবার চেষ্টা হইতেছে? মানসিক পরাধীনতার ভারে অবনত হইয়া পড়িলে মানুষের পক্ষে কোনও প্রকার স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব হইবে। লেখক কি তাহাই চান?

তৃতীয় প্রবন্ধ শ্রীমতী অ্যানি বেসান্টের জীবনীর অষ্টম অধ্যায়। তাহাতে বলা হইয়াছে "কৃষ্ণমূর্ত্তি মেসায়া বা ত্রাণকর্ত্তা নহেন:—কৃষ্ণমূর্ত্তি সর্ব্বস্বত্যাগী পুরুষ"। তিনি সিনেমা কোম্পানীর সপ্তাহে দুই হাজার টাকার offer প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার temperamentএর সঙ্গে মিল হয় নাই বলিয়া তিনি সিনেমা কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করেন নাই। কৃষ্ণমূর্ত্তি স্বয়ং বলিতেছেন—"আমারস্নেহময়ী জননীর আদর্শে নিজ জীবন গঠন করিয়া জীবন ধারণ করিতে আমি মনস্থ করিয়াছিলাম, এবং আমি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইতে চাহিয়াছিলাম। পরবর্ত্তীকালে ডাক্তার বেসান্ট এবং অন্যান্যেরা আমার সামনে জগদ্‌গুরুর অপর এক আদর্শ প্রদর্শন করাইলেন। আমি এই আদর্শ উপলব্ধি করিতে যত্নপরায়ণ হইয়াছি। ইহা ত খুব স্বাভাবিক কথা। যিনি উক্ত আদর্শ উপলব্ধি করিতেই যত্নবান, জোর করিয়া তাঁহার দেহকে "ত্রাণকর্ত্তারূপে জগতগুরুর আবির্ভাবের অবলম্বন" বলা বুদ্ধিজীবী স্বাধীনতাকামী ও স্বাধীনতাপ্রাণ মানবের উপযুক্ত নহে নিঃসন্দেহ। সময়ে সময়ে "আরাধ্যদেবের সহিত একত্ববোধ" করিলেই যে তাঁহাকে অভ্রান্ত জগৎগুরু ভগবানের আসনে বসাইতে হইবে, একথা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। এই প্রকার অন্ধ বিশ্বাস করিবার উপদেশ দিয়া ভারতকে পরাধীনতার পথে কি প্রকার লইয়া যাওয়া হইতেছে, বিবেচক ব্যক্তিমাত্রই তাহা উপলব্ধি করিবেন। এখন আমাদের প্রশ্ন এই যে প্রকৃত জগৎগুরু কে? জগৎগুরু যিনি হবেন, তিনি স্থান কাল ও অবস্থানিরপেক্ষ জগৎগুরু হবেন। যখন Bishop Leadbeater বলিতেছেন (এবং সেই কথাই যদি আমাদের বিশ্বাস করিতে হয়) যে তিনি (Bishop) শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়াছেন,তবে তিনিই বা অভ্রান্ত জগৎগুরু না হবেন কেন? তার পর লেখক একস্থলে বলিতেছেন যে, 'ডাক্তার অ্যানি বেসান্ত যোগসাধনায় বিশপ অপেক্ষা কখনই ন্যূন নন, বরং কোন কোন অংশে তিনি অধিকতর উন্নত'; তবে কি অ্যানি বেশান্টই অভ্রান্ত জগৎগুরু? সংশয়ে দোদুল্যমান আমাকে কে নির্ভুল উপদেশ দিবেন? অন্তরের ভগবান অকিঞ্চনগুরু ব্যতীত ন কোহপি ন কোহপি। আমাদের বিবেচনায় যে মানুষকে অভ্রান্ত জগদগুরুর আসন দেওয়া হয়, সেই মানুষকে অশ্রদ্ধা ও অপমান করা হয়—তাঁহার বুদ্ধির উপর আমাদের যে প্রকৃত আস্থা নাই, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

"বারাণসীধামে তত্ত্ববিদ্যা সমিতির ৫৩ তম বাৎসরিক মহাধিবেশনের বিবরণ পড়িলাম। ইহারও কেন্দ্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্ত্তিকে জগদগুরুরূপে extol করা। উহাতে তাঁহার সহিত জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নোত্তর যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জগদগুরুর উপযুক্ত উত্তর দেখিলাম না। আমাদের মনে হয়, ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি প্রাচীন ধর্ম্মসমূহের মর্ম্মকথা বাহির করিবার যে ভাবে চেষ্টা করিতেন, সেই ভাবে তত্ত্ববিদ্যাসমিতির কার্য্য পরিচালিত হইলে ধর্ম্মজগতের অনেক নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

Navavidhan—May 7 & 14, 1929—ডাঃ এন্ ম্যাকনিকল ডি-লিট লিখিত একটি প্রবন্ধ Are All Religions Equally True" (সমস্ত ধর্ম্ম সমানভাবে সত্য কি না)? বাহির হইয়াছে। Equally (সমান ভাবে) শব্দের নীচে আমরা কসি দিয়েছি। দেখা যাক, প্রবন্ধটি কতদূর যুক্তিসহ। তিনি বলিতেছেন "ধর্ম্মমতে গভীর পার্থক্য সহ্য করিতে না পারিলে ভারতের উদ্ধারের আশা নাই।" "ধর্ম্মবিশ্বাসকে দুর্ব্বল করিলে (তাহা) সহ্য করা যায়, যাহা প্রার্থনীয় নহে" অথবা "যে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা আধ্যাত্ম রাজ্যে উন্নত স্থানে লইয়া যায়, সেই স্বাধীনতা স্বীকার করিলেও (তাহা) হইতে পারে"। এই মন্তব্যের সহিত আমাদের কোনও বিরোধ নাই।

তিনি এই বিরোধ তাড়াইবার যে প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহারই সহিত আমাদের বিরোধ। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি হইলেও তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অবলম্বনে উহার প্রতিবাদে সাহসী হইতেছি। তিনি বলেন—"পার্থক্য সহ্য করা ঠিক এবং একান্ত কর্ত্তব্য, এইটি মনে বসাইতে গেলে এক পথ হইতেছে যে, সকল ধর্ম্ম সত্য, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা।" গোড়ায় এই প্র

premises দাঁড় করাইলেন, ইহাই তো ভুল। আমাদের দেশে, সকল দেশেই এমন অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, যাহারা পরস্পরের মতগত গভীর পার্থক্য সহ্য করে, অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি সমদৃষ্টি হয়। ইহা অনুমান নহে, ইহা প্রত্যক্ষ। আমাদের দেশে গীতা এই ভাবেই সমদৃষ্টি হইবার উপদেশ দেন। সকল ধর্ম্ম সত্য হইলে গীতায় বিভিন্ন ধর্ম্মের সমালোচনা নিরর্থক হইত। ব্রাহ্মধর্ম্মও উদারতম বীজের উপর দাঁড়াইয়া সকল ধর্ম্মকেই সমদৃষ্টিতে ও উদারভাবে দেখিতে বলেন, কোনও ধর্ম্মকেই নিন্দা করা সমর্থন করেন না। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া লেখক নিজের বক্তব্য সমর্থন করিতে চান। পরমহংসদেব বলেন—"সকল ধর্ম্মই ঈশ্বরের অভিমুখে লইয়া যায়"। ইহা তো তাঁহার বহু পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ভারতবাসীর প্রাণের কথা—'নৃণামেকো গম্য স্তমসি পয়সামর্ণব ইব'—সমুদ্রে যেমন সকল নদী পড়ে, সেইরূপ সকল মানুষেরই একমাত্র ভগবান গন্তব্যস্থল। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, পাপী তাপী সাধু অসাধু সকলেরই হৃদয়ে ভগবান মঙ্গলমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত আছেন এবং যথাযথ উপায়ে প্রত্যেককে নিজের অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন; একটি মানুষ, একটি জীব, একটি অণুপরমাণুও তাঁহার ত্যাজ্য নহে, পরিত্যক্ত নহে।

মহাত্মা গান্ধীর মত, যাহা লেখক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা লেখকের বিরুদ্ধে আমাদিগকেই সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাঁহার সিদ্ধান্ত—"সকল ধর্ম্মই সত্য ছিল এবং প্রত্যেক ধর্ম্মেই কিছু না কিছু ভুল ছিল * * * আমার ধর্ম্মে আমি থাকিলেও অন্য ধর্ম্মও আমার প্রিয়"। "আমি মন্দকে সহ্য করিব না"। লেখক নিজেই এই সকল উক্তির উপর মন্তব্য করিতে গিয়া বলিতেছেন যে, মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বাস এই যে "প্রত্যেক ধর্ম্মই ভাল ও মন্দে মিশ্রিত"। "তিনি বাস্তবিক বিশ্বাস করেন না যে, সকল ধর্ম্মই সমানভাবে সত্য"। ইহার উপর আমাদের টিপ্পনী অনাবশ্যক। অথচ লেখক গোড়াতে নিজের মূলকথা অর্থাৎ সকল ধর্ম্ম সমানভাবে সত্য এই মতের সমর্থকরূপে পরমহংসদেব, মহাত্মা গান্ধী এবং অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণম, এই তিন জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। লেখক শেষোক্ত অধ্যাপকের মত উদ্ধৃত করিয়া বলেন "হিন্দুধর্ম্ম ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল ভাবকেই সংঘটিত সত্য বা facts বলিয়া গ্রহণ করেন এবং সেগুলির ন্যূনাধিক অন্তর্নিহিত significance অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করেন"। এই উক্তিও লেখককে সমর্থন করে না। এই প্রবন্ধ এখনও চলিবে। যে অংশটুকু বাহির হইয়াছে, তাহার উপরেই আমাদের বক্তব্য বলিলাম। আসল কথা এই যে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ন্যায়ের ফাঁকির সাহায্যে যিনি যতই বলুন, "সকল ধর্ম্মই সমান সত্য", একথা কিছুতেই টিঁকিতে পারে না। তাহা যদি হইত, তবে আমরা এই সোজা কথা ভুলিয়া যাই কেন যে, অতি পুরাকাল অবধি আজ পর্য্যন্ত এত ধর্ম্মসংস্কারের সম্ভাবনা কিছুতেই আসিতে পারিত না।

আর একটী প্রবন্ধ বিবেচনার যোগ্য—"ব্রাহ্ম স্ত্রীলোক এবং অভিনয়"। Statesman পত্রে H D.B. স্বাক্ষরিত এক পত্রে ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদিগের পেশাদার অভিনেত্রীদিগের ন্যায় টাকা লইয়া প্রকাশ্যে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সমর্থিত হইয়াছে। সেই পত্র টিপ্পনীসহ প্রকাশিত হইয়াছে। টিপ্পনী হইতে বুঝিতে পারিলাম না যে নববিধান সমাজ প্রকাশ্যে অর্থের বিনিময়ে রঙ্গমঞ্চে সাধারণ অভিনেত্রীদিগের ন্যায় অভিনয় করা উচিত বলিয়া স্বীকার করেন কি না। এরূপ অভিনয় যে দুর্নীতির সহায়—দুর্নীতির পথে ইহা যে thin end of the wedge, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করেন ও করিবেন। জাগিয়া ঘুমাইলে যেমন ঘুম ভাঙ্গানো অসম্ভব, সেইরূপ কুফল জানিয়াও ঐ পথে কেহ চলিলে তাহাকে ফিরানো দুঃসাধ্য। ব্রাহ্মসমাজ যদি সন্তানগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করেন, তবে সবল ও দৃঢ়ভাবে এই রঙ্গমঞ্চে মহিলানৃত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। নারীনৃত্যের সাহায্যে সংগৃহীত অর্থও দৃঢ়চিত্তে পদাঘাতে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব—১৬ চৈত্র ১৩৩৫—"নববিধানে বিশ্বাস" প্রবন্ধে লেখক একদিকে বলিতেছেন—"প্রত্যেক ধর্ম্মই আংশিক ধর্ম্ম", পরক্ষণেই অপরদিকে বলিতেছেন—"কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মই * * * মানবমাত্রেরই গ্রহণীয়"। দুঃখের বিষয় গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন যুক্তি দেন নাই।

"উপার্জ্জন ও শিক্ষা"তে উক্ত হইয়াছে—ধর্ম্মবিধানে ভিক্ষাই শ্রেয়, উপার্জ্জন হেয়।" লেখক ভগবানের কৃপাভিক্ষার সঙ্গে অর্থাদি ভিক্ষাকেও যেন একটু জড়াইয়া ফেলিয়াছেন মনে হয়। ইহার সঙ্গে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" উপনিষদের এই সকল উক্তির যেন বিরোধ দৃষ্ট হয়। সংসারের দিক দিয়া ধরিলে এই প্রশ্ন আসে—সকলেই যদি ভিক্ষা করে, তবে ভিক্ষা দিবে কে? এইজন্য সকলের পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি আদর্শ ধরা যাইতে পারে না। শাস্ত্রেও এই কারণে সকল আশ্রমের আশ্রয় বলিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদত্ত হইয়াছে।

"চয়ন"এ কেশবচন্দ্রের একটী বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—বড় সুন্দর।

"প্রশ্নোত্তর ও প্রার্থনা"—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের Theistic Annual হইতে উদ্ধৃত। সময়ান্তরে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

"বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালার ধর্ম্ম"—শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। যে অংশটুকু বাহির হইয়াছে

সুন্দর লাগিল, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এরূপ প্রবন্ধ না পাইলে আলোচনার সুবিধা হয় না।

"নূতন বিধান বলি কেন?" প্রবন্ধটী লাগিল ভাল—ব্রাহ্মধর্ম্ম ভগবানের বিধান বলিয়াই লেখক ইহাকে নূতন বিধান বলিতে চান। আপত্তি কি? কিন্তু গোড়াতেই বলিয়াছেন যে, "প্রবন্ধটী ভক্তিভাজন প্রেরিতপ্রবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বক্তৃতার মর্ম্ম লইয়া পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত"। এইখানে আপত্তি আছে। প্রতাপবাবুর বক্তৃতাটী পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত না করিয়া তদবলম্বনে নূতনভাবে নূতন প্রবন্ধ লিখিলেই ভাল হইত। আবশ্যক হইলে তাঁহার প্রবন্ধটী যেমনটী তেমনটী প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য।

শোক-সংবাদ।

৺বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়—আমাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখিকা ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দৌহিত্রী মাননীয়া শ্রীরত্নমালা দেবীর অন্যতর পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় গত ২৭শে চৈত্র তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও আত্মীয়স্বজনকে কাঁদাইয়া মিহিজামে অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। বহুকাল যাবৎ তিনি পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এবং সহধর্ম্মিণী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে আমাদের অন্তরের গভীর সহানুভূতি জানাইতেছি। মঙ্গলময় ভগবান পরলোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে শোক-ভার বহন করিবার সামর্থ্য প্রদান করুন।

রুক্মিণী দেবী—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর তদানীন্তন স্তম্ভ স্বনামধন্য ৺গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের পত্নী উপযুক্ত পুত্রপৌত্রাদি রাখিয়া গত ১৯শে মার্চ্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় শতবর্ষ হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান পরলোকগত আত্মাকে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করুন।

৺রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—বিষ্ণুপুরের অধিবাসী সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৭ই বৈশাখ মঙ্গলবার রাত্রি দুই ঘটিকার সময় আপন বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। স্বনামধন্য সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইনি জ্যেষ্ঠ সহোদর। শৈশব হইতেই পিতার নিকট শিক্ষা করিয়া সঙ্গীতবিদ্যায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া রামপ্রসন্ন নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রনাথ খাঁন বাহাদুরের সঙ্গীতাচার্য্যের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু সঙ্গীতের আদি উৎসভূমি বিষ্ণুপুরে প্রাচ্য সঙ্গীতবিদ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে দেখিয়া তিনি নাড়াজোল হইতে অবসর লইয়া স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের অনুরোধে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সঙ্গীতবিদ্যালয়টীর পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া উহার অশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। ইহাঁকে হারাইয়া দেশ কেবল যে একজন সুগায়ককে হারাইল, তাহা নহে—একজন সুবাদকের সেবা হইতেও বঞ্চিত হইল। আমরা ইহাঁর সুবৃহৎ পরিবার ও পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহাঁর লোকান্তরিত আত্মার সুগতি বিধান করুন।

সংবাদ।

চিত্রকথা—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম-এ মহাশয়ের সংগৃহীত বাঙ্গালার খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের জননীদের ফটো-চিত্র এবার আমরা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বার-এট-ল মহাশয়ের সৌজন্যে লাভ করিয়া আংশিক প্রকাশ করিলাম। বাকী অংশ এবং এবিষয়ে মন্মথবাবুর সুলিখিত প্রবন্ধটী আমরা আগামী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করি।

অনাথ ব্রাহ্ম পরিবার ধনভাণ্ডার—ব্রাহ্মসমাজের বহুতর সমস্যারমধ্যে 'অনাথ ব্রাহ্ম পরিবার' একটী গুরুতর সমস্যা। এই সমস্যার আংশিক সমাধানের জন্য কিছুকাল হইল ঢাকায় একটী ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত ধনভাণ্ডারে আশানুরূপ অর্থাগম হইতেছে না। সহৃদয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টি এবিষয়ে আকৃষ্ট হইলে সুখী হইব। এই ধনভাণ্ডারে যিনি যাহা দিবেন তাহা সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইলে সঙ্গে সঙ্গে যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

দীক্ষাগ্রহণ।—গত ১লা বৈশাখ রবিবার প্রাতঃকালে ৺হেমেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের মধ্যমপুত্র শ্রীমান্ যোগানন্দ সিংহ আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট সপত্নীক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। এই ধর্ম্মানুরাগী দম্পতিকে ভগবান জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির পথে নিত্য অগ্রসর করুন।

ভ্রমসংশোধন।

গত ফাল্গুন-সংখ্যা পত্রিকায় আস্থায়ী প্রবন্ধে নিম্নলিখিত ভ্রমগুলি গ্রাহক ও পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮২	১	৩০	("আস্থায়ী"	("স্থায়ী
২৮২	২	৩৯	প্রধন	প্রথম
২৮৩	১	৬	বিন্যাসেনান্যতম	বিন্যাসেষন্যতম
২৮৩	১	৬	প্রযুক্তো হংশাদি	প্রযুক্তোংশাদি

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয় ও ব্যয়।

১৮৫০ শক। ১৩৩৫ সাল।

আয়	৭১৬৯৯৶
পূর্ব্ব স্থিত	১০১।০
সমষ্টি	৭২৭০।৯
ব্যয়	৭২৪৩।/৯
স্থিত	২৬৸৶০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিকদান	২২০০৲
আনুষ্ঠানিক	২২৲
উৎসব	১৩৲
হাওলাত	১১৫৸৵০
হাওলাত আদায়	৪৯৲
গচ্ছিত আদায়	১৮৩০।৬
বণ্ডেড্ অয়ার হাউস	১১৫৲
সসপেন্স	৫৩০৲
বিবিধ	৶০
সমষ্টি	৪৮৭৫।/৬

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	২০২৲
হাল	১১০/০
বিজ্ঞাপন	১৯৫৲
মাশুল	২০॥৵০
সাহায্য	১০৲
অগ্রিম	৮৲
নগদ	।০
সমষ্টি	৫৪৫৸৶০

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	৬৬৬।০
তত্ত্ববোধিনী মুদ্রণ	৫৭০৲
সমাজের বক্তৃতা ইত্যাদি	৪৮৲
কাগজের মূল্য	১৬১॥/৬
দপ্তরী	৮৯।০
বিবিধ	২৸০
ব্লকের মূল্য	২৫৸৵৯
সমষ্টি	১৫৬৩৸৩

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	১২৬৶০
গচ্ছিত	৪৩॥/০
কমিশন	৭।৶০
মাশুল	৬৸/০
সমষ্টি	২৮৪৲
সর্ব্বসমষ্টি	৭১৬৯৯৶

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যের পাথেয়	১২০৲
গায়ক	৩৯০৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৬০৲
হিসাবরক্ষক	১২০৲
বেহারা	১৪৪৲
মেথর	২৬।০
সারঞ্জামী	১৪/৬
মাশুল	১১৵০
পাখাকুলি	৪৲
ইলেক্‌ট্রিক	৫০॥৵০
পাখা মেরামত	১৫৲
কেরোসিন	৯/৩
ট্যাক্স	২৭০॥৵০
আলো মেরামত	২৸৵০
হাওলাত শোধ	১১৫৸৵০
হাওলাত প্রদান	৬২৲
ড্রেণ পরিষ্কার	৯৸০
মাঘোৎসব	৯৪॥৶৩
পূর্ত্তকার্য্য	৬৩॥৵৬
সস্পেনশোধ	১১।০
সস্‌পেন্স	২।/০
গচ্ছিত	১৮৬৫৶০
বারবরদারী	২৪।৶৯
বিবিধ	৯৩॥৶৩
পার্ব্বণী	২।০
কাগজক্রয়	৭৩৻৩
মুদ্রাঙ্কণ	৬৯॥৶০
চৈত্রসংক্রান্তি	১০॥১
সমষ্টি	৩৭৫৬।/৩

তত্ত্ববোধিনী।

কাগজের মূল্য	২৩৭৵০
দপ্তরী	৫৫॥/৬
মাশুল	৭৫।/০
মূল্য আদায়ের কমিশন	২৮৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৬০৲
হিসাবরক্ষক	১২০৲
বিজ্ঞাপনের কমিশন	১৩॥০
প্রবন্ধ	২০৲
মুদ্রাঙ্কণ	৫৭০৲
বিবিধ	৩।/৯
সমষ্টি	১১৮২৸৵৩

যন্ত্রালয়।

প্রিণ্টার	৩৩৭৵০
কম্পোজিটর	৫১৮৷৶৩
প্রেসম্যান	২৩৮৷৶০
ইঙ্কম্যান	১৪২৷৴৬
কাগজতোলা	৯৯৷৴০
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৬০৲
হিসাবরক্ষক	১২০৲
প্রুফকাগজ	৯/০
ছাপার কাগজ	১৯০৶০
জলপানী	২৸৴৬
কালি	৭৪৶০
প্রেসের তৈল	৬৷৯
তামাক	৪৷/৬
সাজিমাটী	২৸৬
রুলঢালা	৩৷৶৩
মাশুল	১৷৴০
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	১২৩৸/৯
লেই জন্য ময়দা	১৸৴৬
দপ্তরী	৭৪৶০
বিবিধ	২৫৴৬
ব্লক তৈয়ারী	৫২৷৶০
শিরীষ	৪/০
গ্লাস	১৷৶৬
দড়ি	৸৬
লাইসেন্স	১২৲
বাতি	৷৶৬
অক্ষর	৭/৯
সমষ্টি	২০২০৸৴৯

পুস্তকালয়।

গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য	২৭৸০
কমিশন	২০৷৴৩
মাশুল	৯৸৴৬
বিবিধ	২৻৩
গীতার মূল্য	২২৪৻৩
দপ্তরী	১২৲
পুস্তকক্রয়	৬৸৴০
সমষ্টি	৩০৩৶৩
সর্ব্বসমষ্টি	৭২৪৩৷/৯

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ, তত্ত্বনিধি বিরচিত, বহু চিত্র শোভিত, স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধাই ; কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট, ৪১৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৸০ আনা। সুন্দর সবুজ কাপড়ের। প্রাপ্তিস্থান—আদিব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় ৫৫, আপার চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

আর্য্য নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা কিরূপভাবে প্রদান করিলে তাঁহারা আদর্শ মাতৃত্বের অধিকারিণী হইয়া গৃহ শান্তি ও সুখের আদর্শনিকেতনে পরিণত করিতে পারেন, এই পুস্তকে তিনি তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তক পাঠে মনে হয়, বর্ত্তমানে শিক্ষা ও স্বাধীনতার নামে যে কঠোর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট হইয়া নারীর স্বভাব-কোমল হৃদয়কে কঠোর করিয়া তুলিতেছে এবং পরিণামে তাহাকে সুজননী হইবার পক্ষে অনুপযোগী করিয়া তুলিতেছে, তিনি সেই শিক্ষা ও স্বাধীনতার একান্ত বিরোধী। তিনি সে বিষয়ে মহর্ষি মনুর সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া বলেন—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥'

বিশেষত বর্ত্তমানে আর্টের নামে যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ 'নারীনৃত্যে'র ব্যপদেশে সংক্রামক ব্যাধির মত সমাজের অঙ্গে অঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, তিনি সে বিষয়েও আমাদিগকে সতর্ক হইতে উপদেশ দিয়াছেন—সহবতে শিক্ষা অধ্যায়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনিও ইহুদি দার্শনিক স্পিনোজার মত নারীদের জন্য "Freedom in bondage" শ্রেণীর স্বাধীনতার পক্ষপাতী।

এই পুস্তকের দ্বারা সমাজের প্রভূত মঙ্গল হইবে আশা করা যায়। ভাষা সহজ ও সরল।

সুবর্ণবণিক সমাচার ফাল্গুন ১৩০৫।

গ্রন্থকার প্রাচীন শাস্ত্রের যুক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। :ইহাতে পাশ্চাত্যের বহুপ্রকার দুর্নীতির অনুসরণ হইতে নারীগণকে বিরত থাকিতে যুক্তিযুক্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীনতা অর্থে নারীর বাহিরের স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে গৃহের স্বাধীনতাকেই বরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ডিগ্রী লওয়া বা প্রতিযোগিতার বিদ্যাকে আবশ্যক শিক্ষা বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। গ্রন্থকার ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য হইয়াও হিন্দুর প্রাচীন রীতি নীতি গুলি সমর্থন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। এই গ্রন্থখানি ১৩০৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালার কিছুদিন পূর্ব্বেকার রীতিনীতি, বিশেষতঃ নারীগণের আচার পদ্ধতি, চলন-চরিত্র সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে স্থান পাওয়ায় গ্রন্থখানি বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছে।

মাতৃমন্দির মাঘ ১৩০৫।

ভগবান মাতৃত্বে নারীপ্রকৃতির মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং এই মাতৃত্বের সুপ্রকাশেই নারীত্ব। এই নারীত্বের সম্পূর্ণতার জন্য নারীদিগের শিক্ষার প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতের নারীশিক্ষার উৎকর্ষ গ্রন্থকার বহু

উদাহরণ এবং শাস্ত্রীয় শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার নারীশিক্ষার পাশ্চাত্য আদর্শ আদৌ সমর্থন করেন না। অন্ধভাবে পরানুকরণে পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য প্রণালীমাত্রই যে পরিত্যাজ্য একথা মানিয়া লওয়া যায় কি? এ যুগে অবরোধ প্রথা ও প্রচলিত সংস্কারের সমর্থন কেহ সমর্থন করিবে কি? যাহা হউক, সামান্য দুই একটি বিষয়ে মতান্তর থাকিলেও গ্রন্থকারের শাস্ত্রজ্ঞান, পবিত্র চিন্তাধারা, জাতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশপ্রেম প্রভৃতির জন্য পূজনীয় গ্রন্থকারকে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠক সমাজে ইহার সমাদর সূচিত করিতেছে। আমরা প্রত্যেক শিক্ষিতা মহিলাকে ইহা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

বঙ্গলক্ষ্মী বৈশাখ ১৩৩৬।

প্রকৃতির উপর রাগরাগিণীর প্রভাব—

শ্রীমতী বাণী দেবী।

লেখিকা সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞা। তিনি এই পুস্তকে তাঁহার কতকগুলি অভিজ্ঞতার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রকৃতির উপর যে সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব, ইহা ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ ঋষিগণ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই বৈদিক মন্ত্র গানের ব্যবস্থা—সেই জন্য সামবেদ সামগান নামে অভিহিত। শব্দ ব্রহ্ম এ কথা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে সঙ্গীতের দ্বারা প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারা যাইবে না, এ কথা বলা চলে না। তার পর রাগরাগিণী গানের সঙ্গে সঙ্গে যে তিনি ব্যক্তিত্ব ও ধ্যানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য। যে ধ্যান মানবাত্মাকে বিশ্বাত্মা 'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান' পরব্রহ্মের সান্নিধ্যে লইয়া যাইতে পারে, সে ধ্যান সামান্য প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বঙ্গ সাহিত্যে এ বিষয়ের রচনা বিরল না হইলেও বহুল নহে। আশা করি লেখিকা এ বিষয়ে আরও কিছু লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত করিবেন যে, ভারতীয় সঙ্গীত শুধু দু'দণ্ডের খেয়াল-পরিতৃপ্তির জিনিষ নহে,—ইহা শাশ্বত শান্তির আধার, জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী, কল্প-কল্পান্তরব্যাপী ধ্যানগম্য সাধনার ধন।

সুবর্ণবণিক সমাচার ফাল্গুন ১৩৩৫।



মহিলা কবি তরুদত্তের
জননী—ক্ষেত্রমণি



সুকবি বরদাচরণ মিত্রের
জননী (নাম অজ্ঞাত)



প্যারীচাঁদ মিত্রের জননী
আনন্দময়ী

স্যর গুরুদাস বন্দ্যো-
পাধ্যায়ের জননী—
সোণামণি দেবী



কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যো-
পাধ্যায়ের জননী আনন্দময়ী
দেবী



মানসী ও মর্ম্মবাণীর সৌজন্যে



স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের
জননী অন্নদাসুন্দরী দেবী



বাগ্মী রামগোপাল
ঘোষের জননী—
শ্যামাসুন্দরী



মহাভারত অনুবাদক কালীপ্রসন্ন
সিংহের জননী ত্রৈলোক্যমোহিনী

দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, হেমেন্দ্র
জ্যোতিরিন্দ্র প্রভৃতির
জননী সারদা দেবী



স্যর আশুতোষ
চৌধুরীর জননী
মগ্নময়ী দেবী



একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা
১০৩০

১৮৫১ শক
বৈঃ ৬

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯২৯। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১১১ অঞ্জলি—বন্ধু দেবতা।

১। হে বন্ধু! তুমি আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত কর। সংসারে আমরা যেন কুটিল পথ অবলম্বন না করি। কণ্টকময় পথ ধরিয়া যেন আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত না হই। প্রতি পদে আমরা যেন তোমার অনিমেষ মঙ্গল দৃষ্টির উপর দৃষ্টি রাখিয়া শ্রেয়ের পথে চলি। আমাদের সম্মুখ হইতে সকল অমঙ্গল সকল অনিষ্ট বিদূরিত কর।

২। তুমি আমাদিগকে প্রচুর ধন প্রদান কর যাহাতে আমরা অকুতোভয়ে তোমার মঙ্গল ইচ্ছা ও প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি।

৩। আমরা তোমার দুর্ব্বল সন্তান। শত্রুগণ তাই পদে পদে আমাদের উপর অত্যাচার করিতে সমুদ্যত। তুমি তাহাদিগকে পরাজয় প্রদান কর এবং তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনে আমাদিগকে বিজয়-যুক্ত কর।

৪। আমরা তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমাদের সহায় হইয়া আমাদিগকে ঐশ্বর্য্য প্রদান কর এবং আমাদিগের সুখশান্তি বিধান কর। পূর্ব্বতন পিতৃপিতামহদিগকে আমরা প্রণাম করি, তাঁহারা আমাদিগকে সুপথ প্রদর্শন করুন। মুনি ঋষি ও সাধুপুরুষদিগকে আমরা প্রণাম করি, তাঁহাদের উপদেশে আমাদের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যাক।

৫। তুমিই আমাদিগের পুষ্টিবিধান করিতেছ। তোমারই আদেশে মেঘসকল সুবৃষ্টি বর্ষণ করিতেছে। তুমি আমাদিগকে হিংসা করিও না। তুমি আমাদিগকে বিনাশ করিও না। তুমি আমাদের নিত্যসঙ্গী থাকিয়া আমাদের সকল অভাব মোচন কর, যাহাতে আমাদের শুভকর্ম্মের যজ্ঞসকল সাফল্যমণ্ডিত হয়।

৬। তোমার আদেশে আমাদের জন্য বায়ু মধু বর্ষণ করুক। জলাশয়সকলের জল সুমিষ্ট হোক। ওষধি সকল মধুময় হউক।

৭। নিশীথের শিশির মধু বর্ষণ করুক। উষার অরুণ তপন মধু বর্ষণ করুক। তোমার সন্তানগণের মধ্য হইতে দ্বেষহিংসা অন্তর্হিত হউক। সকল গৃহে, সকল সমাজে, সকল দেশে মঙ্গলবায়ু প্রবাহিত হউক, সুখশান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হউক। তুমিই সকলের পালক। আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

৮। বনস্পতিসকল ছায়াপ্রদান করিয়া আমাদের শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করুক। তেজসমুজ্জ্বল ভানু স্বীয় তেজে রোগবীজ বিনষ্ট করিয়া আমাদের স্বাস্থ্যবিধান করুক। গাভীসকল প্রচুর সুমিষ্ট দুগ্ধ প্রদান করিয়া আমাদের স্বাস্থ্য ও বল বিধানে সহায় হউক।

৯। তুমি যে সুখকর ও কল্যাণকর, সুখ ও কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

নববর্ষে উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের চরণে সম্মুখের বৎসরের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভক্তিভরে প্রণিপাত কর। দুঃখ শোক নিরাশা নিরানন্দ অন্তর্ব্বিবাদ বহির্ব্বিবাদ—সংসারের ছোটখাটো খুঁটিনাটি আজ মন হইতে বিদূরিত কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতে সেই মঙ্গলময় ও মঙ্গলবিধাতা পরমপুরুষের হস্ত উপলব্ধি করিতে বলেন। মানবের ইহাই শ্রেষ্ঠতম অধিকার।

ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর কর এবং ধর্ম্মের পথে ও কর্ত্তব্যের পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হও। সেই অপ্রতিহতশক্তি পরমাত্মার আশ্রয় লইয়া নির্ভীক হৃদয়ে তাঁহার কর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করিলে কোনও বাধাই তোমাকে বাধা দিতে পারিবে না; পদে পদে কথায় কথায় বিভীষিকার অন্ধকার তোমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না। তিনি তোমার অন্তরে যে তেজ, বল ও সাহস প্রদান করিবেন, তাহার তুলনা নাই।

সম্মুখের নূতন বৎসরের জন্য মনকে দৃঢ় কর। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, ভাল হউক বা মন্দ হউক, কথায় কথায় জনসংঘের মতে সায় দিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। অন্তরে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে, যাহা ভাল বলিয়া বুঝিবে, তাহাই নির্ভীকহৃদয়ে অন্তরে ধারণ করিবে এবং তাহাই নির্ভীকতার সহিত প্রকাশ করিবে। সত্য এবং ভাল যাহা কিছু, তাহারই ভিতর ভগবানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখা যায়। সত্য পথে চলিলে এবং কল্যাণপ্রদ শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত থাকিলে ভগবানই তোমার আচারে ব্যবহারে, তোমার মনে ও বাক্যে সহজেই প্রকাশ পাইবেন।

বিগত কয়েক বৎসর যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, সেই সকল ঘটনা হইতে আমরা এই সত্য লাভ করিয়াছি যে, একমাত্র অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ববিবাদ বিদূরিত করিয়া মিলনের ভিত্তিভূমি রচনা করিবার প্রকৃত অধিকারী। ইহা যদি সত্য বলিয়া অন্তরে উপলব্ধি করিয়া থাক, তবে সমস্ত বাধাবিঘ্ন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণে অগ্রসর হও। পদে পদে ভয়ত্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ভগবানকে লাভ করা সম্ভব নহে।

সম্মুখের নূতন বৎসরে শ্রেয়ের পথে মঙ্গলের পথে সাহসের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাঁহার এই প্রেমপূর্ণ আহ্বান শুনিয়া কে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে? আমাদের প্রত্যেকের প্রাণে তাঁহার সেই আহ্বানের সাড়া পাইয়াছি, তাই তো আমরা এখানে পবিত্রহৃদয়ে সম্মিলিত হইয়াছি। আমাদের এই উপাসকমণ্ডলী সংখ্যায় অল্প—তাহাতে কিছুমাত্র আসে যায় না। আমাদের প্রত্যেকের এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বপিতা অখিলমাতা অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসক; আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা প্রত্যেকেই সেই মহাশক্তি হইতে নিঃসৃত এক একটী শক্তিময় অগ্নিকণা; আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা তাঁহারই শক্তি প্রীতি ও জ্ঞানের কণামাত্র পাইয়াও কেবল পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত নহে, কিন্তু ইহলোক ও পরলোক পর্য্যন্ত এক অখণ্ড প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার অধিকারী। তখন সংখ্যায় অল্প বলিয়া মুহ্যমান হইবার কোনই অবসর নাই। সমগ্র জগতকে জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে যে প্রকার দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে দেখিতেছি, তাহাতে নিরাশার পরিবর্ত্তে আশা ও আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠে। আমাদের মধ্যে একজনও যদি ভগবানে হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি সন্ন্যস্ত করি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে অক্লান্তভাবে আপনাকে নিযুক্ত রাখি; আমাদের মধ্যে যদি একজনও প্রকৃতই তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠি, তখন সেই একজনই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্যধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। সংখ্যায় অল্পতা বা অন্য কোনও কারণেই তাঁহার সুমঙ্গল আহ্বানে সাড়া দিতে পশ্চাৎপদ হইও না।

তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী শক্তিতে বলসঞ্চয় করিয়া উত্থান কর, জাগ্রত হও। যে উপধর্ম্মের ফলে পদে পদে পরাধীনতার চরণে মস্তক অবনত হয়, দাসখতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হই, সেই উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে সাহসের সহিত দণ্ডায়মান হও। আঘাত লাগিবার ভয়ে, ব্যথা পাইবার ভয়ে উপধর্ম্ম কুসংস্কার প্রভৃতির নিকটে মস্তক অবনত করিলে চলিবে না। সুখভোগের লালসায়, সোয়াস্তির প্রত্যাশায় নিরবয়ব নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে এক-

মাত্র উপাস্য বলিয়া কেবল নিজের অন্তরে নহে কিন্তু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে পরাংমুখ হইলে চলিবে না। যে প্রেরণা ভগবান আজ আমাদের অন্তরে প্রেরণ করিয়াছেন; সেই প্রেরণার নিকট আমাদিগকে আচারে ব্যবহারে, মনে ও বাক্যে সম্পূর্ণ খাঁটি হইতে হইবে। তবেই আমাদের বাণী সকলেই স্তব্ধ হইয়া শুনিতে থাকিবে।

মহাপুরুষ যাঁহারা, তাঁহাদের কথায় ও কাজে মিল থাকে বলিয়াই তাঁহাদের জীবন, তাঁহাদের বাণী, তাঁহাদের স্পর্শ তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে উৎসাহের ও সাহসের আগুন বিকীর্ণ করিতে পারে। বিশ্বস্রষ্টা ভগবান আমাদের সত্যই পিতামাতা, সকল ঐশ্বর্য্যের আকর পরমেশ্বর আমাদের সত্যই সখা ও সুহৃৎ, সকল জ্ঞান ও শক্তির মূল উৎস পরমাত্মা সত্যই আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা—এই সরল সত্যের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার চরণে উপস্থিত হও, তোমাদের কথা ও কাজ এক হোক; তোমাদেরও স্পর্শ, তোমাদেরও বাণী উৎসাহ ও সাহসের অগ্নি বিকীর্ণ করিতে পারিবে। ভগবানের বিধান এমনই আশ্চর্য্য যে, আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হইলেও সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাইব—তাঁহার অজেয় শক্তির অধিকারী হইব; নিজের নিকট খাঁটি থাকিলে আত্মা সজীব হইয়া উঠিবে; শত বিপদের তরঙ্গ, শত দুঃখের আঘাত তোমাকে মঙ্গলের পথ হইতে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

যদি শ্রেয়ের পথে চলিতে চাও, তবে আজ এই বৎসরের প্রারম্ভে প্রাণের প্রভু যিনি, তাঁহাকে সমুদয় হৃদয়ের প্রীতি সমর্পণ কর এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে আত্মনিয়োগ করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর; তাহা হইলে জগতের সর্ব্বত্র তাঁহার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব সহজেই উপলব্ধি করিবে। জাগ্রত ভগবানের তুমি অনুচর হইয়া থাক; তাঁহাকে করুণাময় পিতা, স্নেহময়ী জননী বলিয়া প্রাণের ভিতর উপলব্ধি কর; দুঃখকষ্টের কঠিন আঘাত পাইলে তাঁহাকেই বন্ধু বলিয়া ডাক—তোমার সমস্ত দুঃখকষ্ট, সকল বিপদ আপদ কি এক অমোঘ শক্তিতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যই বীরের ধর্ম্ম, সাহসী একনিষ্ঠ ভক্তের ধর্ম্ম। আজ বৎসরের প্রারম্ভে সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে অন্তরে সবলে ধারণ করিয়া সম্মুখের বৎসরকে সাফল্যমণ্ডিত কর।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্মকথা।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান তাঁহার অনুপম স্নেহের দানস্বরূপে যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে এই জগতসংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার, সরল ও সবল বাণী আজ এই শুভদিনে শুভ মুহূর্ত্তে তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করিতেছি। তোমরা তাহা হৃদয়ে গ্রহণ কর এবং জীবনে পালন করিয়া পাপ হইতে মুক্তিলাভ কর। তোমাদের শরীর সবল হোক, মন সতেজ হউক এবং আত্মার উন্নতি হউক। তোমরা ইহলোকে কীর্ত্তি এবং পরলোকে সদ্গতি লাভ কর।

ধর্ম্মের গ্লানি ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব

প্রত্যেক মানবের জীবনে এবং জগতের ইতিহাসে ইহা একটা পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ সত্য যে, ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলেই ভগবান যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করিয়া ধর্ম্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব এই সত্যের পক্ষে অনন্ত সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান।

অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতম বাণী

ভগবান যেমন প্রতি মানবের নিজস্ব, সুতরাং সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িকতার অতীত, সেইরূপ তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। ব্রাহ্মধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথম এই উদারতম বাণী ঘোষণা করেন যে, "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে। সকলেরই আত্মাতে ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গলভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্বকার্য্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন পাই। * * * ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ কি কালবিশেষ কি জাতিবিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগেরই ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা

এই উদার বাণী ঘোষণার ফলে সমগ্র জগতের নরনারীর অন্তর হইতে মানসিক পরাধীনতারও শৃঙ্খল খসিয়া গেল। জীবনের আচার-ব্যবহার ও আহার-বিহার সম্বন্ধেও ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্গে ঈশ্বর ও মানবের প্রত্যক্ষ যোগসাধনের সহায়তা হয়, সেইভাবে সকল বিষয় নিয়মিত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। স্বাধীনতার উৎস ভগবান আমাদের অন্তরে দুঃখদারিদ্র্য পাপতাপ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভের এক প্রবল আকাংক্ষা মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।

---

* গত ১লা বৈশাখ নববর্ষ উপলক্ষ্যে আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিবৃত।

ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষযোগ স্বাধীনতার মূল

ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধনই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার মূল। শত নিগ্রহের মুখেও ঐ প্রত্যক্ষ যোগের কথা, ঐ স্বাধীনতার আশ্বাসবাণী, ঐ মুক্তির অমৃতবার্ত্তা অন্তরে গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে প্রচার করিতে হইবে। প্রাচীন বা নবীন কোনও পন্থারই শুষ্ক মতামত ও শুষ্ক অনুষ্ঠানের কঠিন বাঁধন মানুষকে চিরকাল বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। সকল পন্থার ভিতর যাহা সত্য ও ভাল, তাহাই সুরক্ষিত করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। মানুষের প্রাণে ঐ সকল অন্যায় বন্ধন কাটাইয়া একটা সরল ও সবল ধর্ম্মের অভাব অনেক সময়েই জাগিয়া উঠে। যে ধর্ম্ম স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যক্ষ যোগের উপদেশ দেন এবং তাহার পথে অর্গলস্বরূপে দণ্ডায়মান মত বা শাস্ত্রকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিবার দৃঢ় অনুশাসন দিতে পারেন, তাহাই সেই সরল ও সবল ধর্ম্ম। তাহারই অন্য নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল অবলম্বন—পরমাত্মা ও জীবাত্মা

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল অবলম্বন দুইটী—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। পরমাত্মা সমুদ্র, জীবাত্মা স্রোতস্বতী; পরমাত্মা সূর্য্য, জীবাত্মা চন্দ্র; পরমাত্মা আতপ, জীবাত্মা ছায়া; পরমাত্মা পিতা, জীবাত্মা পুত্র। এই উভয়ের বাহিরে গিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুকে ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া পূজা করিলেই সাম্প্রদায়িকতা আসিবে, এবং সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম কলুষিত হইবে। ধর্ম্মের বহিরাবরণেরই সহিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বা উপধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য থাকে পাঁচজনের মতে বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদি যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে সম্পাদনের উপর। কিন্তু সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট ইহা অবান্তর কথা; তাহার প্রধান লক্ষ্য ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের প্রত্যক্ষ যোগসাধন। ধর্ম্মের বহিরাবরণ মানুষের প্রস্তুত, প্রকৃত সত্যধর্ম্ম ভগবৎপ্রেরিত। সত্যধর্ম্মে ঈশ্বর ও মানবের মধ্যবর্ত্তী অভ্রান্ত গুরু প্রভৃতির কোনও স্থান নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও আত্মপ্রত্যয়

ব্রাহ্মধর্ম্ম অধ্যাত্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা কিছু, সকলই আত্মাকে লইয়া এবং আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে লইয়া। ইহার মূল ভিত্তি ও প্রমাণ আত্মপ্রত্যয়। আত্মপ্রত্যয়ের মূল কথা হইতেছে—প্রত্যেকের নিজ নিজ আত্মাতে প্রত্যয়, অর্থাৎ প্রত্যেক মানবের আত্মাতে পরমাত্মা যে সকল সহজ সত্য নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সেই সকল সহজ সত্যের উপর অটল আস্থা। সেই সকল সত্যকেও সাধারণতঃ সংক্ষেপে আত্মপ্রত্যয় বলা হয়। এই সকল সহজ সত্য ভগবান অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছেন বলিয়া উহা আমরা বাহির হইতে পাই না, সেগুলি আমরা ভিতর হইতে স্বত-উত্থিতরূপে প্রাপ্ত হই। সেই সমস্ত সত্যকে মূলে ভিত্তি না করিলে বিজ্ঞানও দাঁড়াইতে পারে না, তর্কও চলিতে পারে না; এমন কি, আমাদের জীবনযাত্রাই নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

"এই আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি সংশয় করিতে গেলে একেবারে যুক্তির মূলচ্ছেদন করা হয়। তাহা হইলে আপনার অস্তিত্বে, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বে এবং কার্য্যকারণের অস্তিত্বে সংশয় জন্মিয়া বুদ্ধি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আত্মপ্রত্যয়ের উপর যিনি নির্ভর না করেন, তিনি কখনও জ্ঞানগোচর নিত্য সত্য মঙ্গলস্বরূপ পূর্ণ পুরুষের প্রতি নিঃসংশয় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, প্রতি তর্কের তরঙ্গে তিনি অস্থির হয়েন এবং ঈশ্বরসহবাসজনিত সুনির্ম্মল শান্তি কদাপি লাভ করিতে পারেন না"।

শাস্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি নহে

আত্মপ্রত্যয়ের উপর স্থিরপদে দাঁড়াইলেই আমরা বুঝিব যে, আত্মা যখন নরনারীমাত্রেরই আছে এবং পরমাত্মা যখন প্রতিজনের আত্মাতে অবস্থিত, তখন জাতিবিশেষ ব্যক্তিবিশেষ প্রভৃতির কোনও শাস্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে না। শাস্ত্রের যে অংশে আত্মপ্রত্যয় সায় দিবে, সেই অংশই আমরা গ্রহণীয় বলিয়া মানিতে পারি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র

ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র হইতেছে—বিশ্বস্রষ্টা, নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, স্বতন্ত্র, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, নির্ব্বিকার, পরিপূর্ণ ও অপ্রতিম পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ একমাত্র তাঁহারই উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। ইহারই উপরে অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম দণ্ডায়মান।

পূর্ণপুরুষ বিশ্বস্রষ্টা

পূর্ণপুরুষ পরমেশ্বরেরই ইচ্ছাতে জগত সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি স্বয়ম্ভূ ও স্বপ্রকাশ। তিনি অকৃত কারণ। সৃষ্টিকার্য্য একটী প্রণালী মাত্র। সৃষ্টির কারণ সৃষ্টির অতীত ইচ্ছাময় পরব্রহ্ম। তাঁহার আদি নাই, কারণ নাই। তিনি অনাদি। যে দর্শন করে, স্পর্শ করে, শ্রবণ করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, মনন করে, বোধ করে ও কর্ম্ম করে বা ইচ্ছা করে এবং যে জানে যে, সে-ই সকল কার্য্য করে, তাহাকেই পুরুষ বলা হয়। আমরা তাহাকেই পুরুষ বলি, যাহার ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব আছে, যে কর্ত্তা ও নিয়ন্তা হইবার অধিকার রাখে, যাহার জ্ঞান আছে, প্রীতি আছে। ইচ্ছা প্রভৃতি হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না।

পূর্ণপুরুষ পরিমিত পুরুষের কারণ ও আশ্রয়

আমরা সকলেই পুরুষ বটে, কিন্তু সীমাবদ্ধ। এই অগণিত পরিমিত পুরুষ আসে কোথা হইতে? আমরা এই পরিমিত ইচ্ছা, ভাব ও শক্তি প্রভৃতি পাই কোথায়? জন্মের পূর্ব্বে বা পরে কেহই এসকল আমাদের ভিতরে বসাইয়া দিতে আসে না। আর আমরা দাঁড়াই বা কাহার আশ্রয়ে? পরিমিত কোন কিছুই আপনাপনি আসিতেও পারে না, আর বিনা আশ্রয়ে দাঁড়াইতেও পারে না। কাজেই বলিতে হয় এবং আত্মপ্রত্যয়ও সমর্থন করে যে, আমরা যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা পুরুষেরই ইচ্ছাতে ক্ষুদ্র ও পরিমিতশক্তি আমরাও সমুদ্ভূত হই, এবং তাঁহারই মঙ্গলবিধানে জ্ঞানে ধর্ম্মে ও প্রীতিতে সমুন্নত হই। যে ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্বের বলে এই অসীম আকাশে অসংখ্য রবিচন্দ্রগ্রহতারকা বিধৃত হইয়া অভ্রান্ত নিয়মে কার্য্য করিয়া চলিয়াছে; যে জ্ঞানের এবং যে প্রীতির কণামাত্র পাইয়া কোটী কোটী যুগযুগান্ত ধরিয়া মানবসমাজ দেবত্বের অভিমুখে উন্নীত হইয়া চলিয়াছে, সে ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্বের, সে জ্ঞান ও প্রীতির উৎস, এই বিশ্বজগতের এবং পরিমিত পুরুষ আমাদেরও স্রষ্টা, নিয়ন্তা, মূল কারণ ও আশ্রয়, পরব্রহ্ম ব্যতীত কোন পরিমিত পুরুষ হইতে পারে না।

বিশ্বস্রষ্টা অন্ধ শক্তি নহে

এই বিশ্বচরাচর আপনাপনি সমুদ্ভূতও হয় নাই এবং ইহা কোন অন্ধ শক্তিরও কার্য্য নহে। আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, শক্তি কোন অবলম্বন ব্যতীত আপনাপনি দাঁড়াইতে পারে না—শক্তির পশ্চাতে কোন শক্তিমান পুরুষ থাকিবেই।

শক্তি ও শক্তিমান পুরুষ

শক্তি শক্তিমান আত্মাতে ওতপ্রোতভাবে অধিশ্রিত থাকিলেও উভয়ে এক ও অভিন্ন হইতে পারে না। একই আত্মাতে আমরা সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্ম্মী শক্তি—আঘাত করিবার শক্তি এবং প্রীতি করিবার শক্তি—অধিশ্রিত দেখিতে পাই। সজ্ঞান ইচ্ছাবিশিষ্ট পুরুষের আত্মা ঐ সকল বিভিন্ন শক্তির আশ্রয় হইলেও এবং উভয়ের মধ্যে ব্যবধানবিহীন ওতপ্রোতভাব থাকিলেও উভয়ে পৃথক। সূর্য্য হইতে সূর্য্যরশ্মি নিঃসৃত হইলেও এবং সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যেতে অভিন্নভাবে অধিশ্রিত থাকিলেও সূর্য্য ও তাহার রশ্মি পরস্পর যেমন পৃথক্, সেইরূপ এই বিশ্বকার্য্যে যে সমস্ত শক্তি কার্য্য করে, সেই সকল শক্তি ইচ্ছাময় জ্ঞানময় পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত হইলেও এবং তাঁহাতে অভিন্নভাবে আশ্রিত থাকিলেও তাঁহা হইতে ভিন্ন ও পৃথক—তিনি স্বতন্ত্র। কার্য্যকারণসমন্বিত এই বিশ্বজগত এবং বিশ্বজগতের শক্তিসমূহ, সমস্তই যখন তাঁহারই ইচ্ছা হইতেই সমুদ্ভূত, তখন ইহা সুস্পষ্ট যে, ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টির অতীত, স্বয়ম্ভূ ও অকৃত কারণ। সেই অকৃতকারণকে সমস্ত প্রকৃতির মূল কারণরূপে বুঝিলেই আত্মার জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি হয়।

মহান পুরুষ বিশ্বনিয়ন্তা

সেই মহান পুরুষ এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তিনি বিশ্বনিয়ন্তা বলিয়াই কি সূর্য্যে, কি ক্ষুদ্র পৃথিবীতে, ভূলোক ও দ্যুলোকের সর্ব্বত্র একই অভ্রান্ত নিয়ম ও একই শক্তিকে বিভিন্ন আকারে প্রকারে কার্য্য করিতে দেখা যায়—অশেষ বৈচিত্র্যের মধ্যে মহান ঐক্য দৃষ্ট হয়। তিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মারও নিয়ন্তা অন্তর্যামী পুরুষ। তিনি বাহিরের বস্তু হইলে আমাদের অন্তর্নিহিত ইচ্ছা প্রভৃতির ভিতর দিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিতাম না।

তিনি অনন্ত

যাহার আদি আছে, তাহারই অন্ত আছে। তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি দেশকালের দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন নহেন, সুতরাং তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বদর্শী। তিনি নিত্য। এই অনন্ত স্থান ও এই অনন্ত কাল তাঁহারই অনন্ত ভাবের ছায়া মাত্র।

তিনি জ্ঞানস্বরূপ

তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহারই অভ্রান্ত নিয়মসকল বিশ্বজগতে কার্য্য করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃতিতে তিনি যে জ্ঞানের কণা দিয়া রাখিয়াছেন, তাহারই উপরে আমাদের জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগ অবলম্বিত হইয়া আছে।

তিনি মঙ্গলস্বরূপ

তিনি মঙ্গলস্বরূপ। কি সুখসম্পদ কি দুঃখবিপদ সকলেরই মধ্যে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা লুক্কায়িত আছে। যতক্ষণ আমাদের অভাবসকল সহজে পূর্ণ হয়, ততক্ষণ ভাবি না যে, এক মঙ্গলময় পরম পুরুষ আমাদের "প্রয়োজন জানিয়া বহুপ্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন।" অজ্ঞানবশত আমরা অনেক সময়ে মনে করি যে, এই বিশ্বজগত অমঙ্গল ও দুঃখেরই রাজ্য। তাহার জন্য আমাদের স্বেচ্ছাকৃত কার্য্য যে অনেক সময়ে দায়ী তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। মঙ্গলময়ের রাজ্যে কোন্ মূল কারণে অমঙ্গল আসিল, দুঃখের স্বরূপ কি, ঈশ্বর দুঃখে পরিণত হইয়াছেন কি না, এই প্রকার কূটতর্ক সকল আমাদিগকে সরল পথ হইতে দূরে লইয়া গিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা উপলব্ধির পথে বাধা প্রদান করে। ঐ সকল প্রশ্নের বিষয় প্রকৃতির অতীত। প্রকৃতির ভিতরে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ সকল প্রশ্নের সমাধান করা অসম্ভব। জগত অপূর্ণ বলিয়াই জগতে

সুখের সঙ্গে দুঃখ, মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গল আছে। দুঃখ বা অমঙ্গলের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার চেষ্টা নিরর্থক। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রত্যক্ষ সত্যের উপর দাঁড়াইয়া বলেন যে, সুখ দুঃখ, মঙ্গল অমঙ্গল সকলের ভিতর দিয়া জগতের চির-উন্নতি, চির-মঙ্গল ও আনন্দের পথে অগ্রসর হওয়াই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। জগতে যে সকল অভ্রান্ত মঙ্গল নিয়ম কার্য্য করিতেছে, সে সকলের উৎস অন্ধ শক্তি হইতে পারে না—সে সকলের প্রতিষ্ঠাতা মঙ্গলময় বিশ্ব-বিধাতা পরম পুরুষ। তিনি প্রতি অণুপরমাণুতে, প্রতি আত্মাতে ওতপ্রোত থাকিয়া প্রতি ঘটনাকেই মঙ্গল উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

তিনি নিরবয়ব

তিনি নিরবয়ব ও নির্ব্বিকার। তাঁহার শরীর থাকিলে অবশ্য দেশে ও কালে সীমাবদ্ধ হইতেন। তাঁহার যখন অবয়ব নাই, তখন তাঁহার কোন প্রকার বিকারও সম্ভব নহে। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়। তিনিই একমাত্র বিশ্বজগতের অণুপরমাণুতে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনিই একমাত্র অনাদি ও অনন্ত কাল ব্যাপ্ত করিয়া থাকিতে পারেন—অন্য কাহারও সে ভাবে থাকিবার অবকাশ নাই। এই প্রকৃতি তাহার স্রষ্টার জ্ঞানকে অতিক্রম করিতে পারে না। তিনি আনন্দে অদ্বিতীয়, তিনি শান্ত-ভাবে অদ্বিতীয়। তিনি অদ্বিতীয় বলিয়াই একই শক্তি, একই মঙ্গল উদ্দেশ্য ভূলোক-দ্যুলোক সম্বলিত এই ব্রহ্মচক্রের সর্ব্বত্র অভ্রান্ত নিয়মে কার্য্য করিতেছে। তিনিই সকলের আশ্রয়। কি বহির্জ্জগত, কি মানবাত্মা সকলই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে।

তিনি সর্ব্বজ্ঞ

তিনি সর্ব্বজ্ঞ। প্রতি অণুপরমাণুতে এবং প্রতি আত্মাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত থাকিয়া তিনি সকলই জানিতেছেন।

তিনি অপ্রতিম

তিনি অপ্রতিম। তিনি অনাদ্যনন্ত ও অদ্বিতীয় বলিয়াই অপ্রতিম। তাঁহার তুলনা নাই। কোনও সৃষ্ট পদার্থকেই তাঁহার প্রতিমা ধরা যাইতে পারে না। কোনও মনুষ্যকেও তাঁহার পূর্ণাবতার বলা যায় না।

তিনি স্বপ্রকাশ

তিনি স্বপ্রকাশ। আকাশে বাতাসে, সূর্য্যে চন্দ্রে, পুষ্পে গন্ধে, ভূধরে সাগরে, গ্রহতারার নীরব গতিতে এবং পাপতাপের সহিত সংগ্রামে জয়লাভজনিত অপার শান্তিতে, সকলের মধ্যেই তিনি নিত্য স্বপ্রকাশ।

ব্রহ্মপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন

সেই অনন্তস্বরূপের প্রতি আমাদের প্রকৃষ্ট প্রীতি ভক্তি স্বতই ধাবিত হয়। তিনি যে প্রীতি আকর্ষণ করেন, কোনও পরিমিত বস্তু সে প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না। ভগবানকে বিশ্বপিতা অখিলমাতা বলিয়া প্রাণে উপলব্ধি করিলেই তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনেও প্রবৃত্তি স্বতই আসিবে। তাঁহাকে প্রীতি করিব, অথচ তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন করিব না—ইহা মিথ্যা কথা। তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনই হইল তাঁহার পূজার উপকরণ। তাঁহার পূজার জন্য বাহির হইতে ধূপ ধুনা পুষ্পাদি সংগ্রহের প্রয়োজন নাই, জীবজন্তু বলি দিবারও প্রয়োজন নাই অথবা প্রতিমাগঠনও আবশ্যক নহে। আমাদের অন্তরে যে প্রীতি নিহিত আছে, সেই প্রীতি দ্বারা আত্মার অন্তরাত্মাকেও প্রীতি করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। ব্রহ্মপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধন, উপাসনার এই দুইটী অঙ্গ ভগবৎপ্রীতিরই দুই আকার। উভয়ে এত ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ যে, একটীকে ত্যাগ করিলে অপরটী ম্লান ও পরিশুষ্ক হইয়া যায়।

তাঁহার উপাসনাতে মঙ্গল ও উন্নতি

তাঁহার উপাসনাতেই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি সন্নিবদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্মকে শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে অন্তরে ধারণ করিয়া বিশ্বপতি পরমাত্মাকে হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি সমর্পণ করিলে এবং তাঁহার আদেশ ও প্রিয়কার্য্য জানিয়া নিজের মঙ্গল এবং দেশের ও জগতের কল্যাণসাধনে নিরত থাকিলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

হে পরমাত্মন্! তোমাকে জানিবার ও প্রীতি করিবার অধিকার আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ। তোমাকে প্রীতি করিবার এবং তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার উপযুক্ত ইচ্ছা ও শক্তি দাও, যাহাতে আমরা সেই অধিকার লাভের উপযুক্ত হই এবং জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উন্নত হইয়া তোমার চরণস্পর্শ লাভ করিয়া কৃতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—

দীক্ষার্থীকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণে আহ্বান।

(আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

হে প্রিয়দর্শন! হে আয়ুষ্মতি! তোমাদের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্মকথা এবং বীজমন্ত্র প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ কর।

সর্ব্বপ্রথম প্রতিজ্ঞা হইতেছে—"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলদাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গল-স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার

উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।" ঈশ্বরের উপাসনাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতেছে—"পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোনও বস্তুর আরাধনা করিব না।" ব্রহ্মোপাসকের এই প্রতিজ্ঞাটী দৃঢ়রূপে অন্তরে ধারণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মে পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা করিবার অবসর নাই। ভূমা পরমেশ্বর সৃষ্টির অতীত—স্থান, কাল ও সর্ব্ববিধ সীমার অতীত; সৃষ্টবস্তুমাত্রই অন্তত স্থানে বা কালে সীমাবদ্ধ হইবেই। সুতরাং আমাদের ক্রমোন্নতিশীল আত্মার শ্রদ্ধাভক্তি পরিমিত বস্তুতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

ঈশ্বর কোন এক ব্যক্তিতে বা জাতিতে বা দেশে বা কালে আবদ্ধ নহেন। প্রাণের ইচ্ছা লইয়া সরল পথে তাঁহার নিকট যাও, সকল বাধাই অতিক্রম করিবে। তিনি প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং আমাদের প্রত্যেকের পিতামাতা। এই সরল কথা ভুলিয়া মানুষকে যতই শ্রদ্ধা কর না কেন, অতিপ্রাকৃত অবতাররূপে ভগবানের আসনে বসাইও না। একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত অতিপ্রাকৃত বা প্রকৃতির অতীত আর কেহই হইতে পারে না।

অগ্নিহোত্রী যেমন তাঁহার পূজার অগ্নিকে অবিচ্ছেদে প্রজ্জ্বলিত রাখেন, আমাদেরও অন্তরে বিশ্বপিতা অখিলমাতা ঈশ্বরের উপাসনাকে সেইরূপ একনিষ্ঠভাবে জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে।

তিনি নিরাকার বলিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের পূজা দিতে ক্ষান্ত হইও না। সেই অন্তর্যামী পরম পুরুষ শূন্য নিরাকার নহেন। আমাদের আত্মা যেমন নিরাকার—ইচ্ছা, শক্তি, জ্ঞান ও প্রীতিবিশিষ্ট নিরাকার পুরুষ, অনন্তমঙ্গল ভগবানও সেইরূপ অনন্ত ইচ্ছা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রীতিবিশিষ্ট নিরাকার পরম পুরুষ। নিরাকার বলিয়াই যেমন আমাদের আত্মা আমাদের দেহ ও মনের সকল অংশ একই সময়ে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়, তেমনি সেই পূর্ণ পুরুষ নিরাকার বলিয়াই কি বহির্জ্জগতের, কি অন্তর্জ্জগতের প্রত্যেক অংশ নিজের পূর্ণস্বরূপে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি এইরূপে নিজের অরূপ রূপে তাঁহার ব্রহ্মচক্রের প্রত্যেক অংশ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন বলিয়াই সর্ব্বত্র ও সকল অবস্থাতেই তাঁহার পূজা করা সম্ভব। এই কারণেই উপাসকের সহিত উপাস্য ভগবানের প্রত্যক্ষ যোগ।

ব্রহ্মোপাসকের একদিকে উপধর্ম্ম, অপরদিকে নাস্তিকতা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। উপধর্ম্ম মন্দ বলিয়া নাস্তিকতার প্রতি ঝুঁকিলে চলিবে না। বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে এবং নিজের আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইবে যে, নাস্তিকতার কোনও ভিত্তি নাই। অপরদিকে, মূর্ত্তিপূজা বল, অবতারবাদ বল, সর্ব্বপ্রকার উপধর্ম্মই পরিণামে মানবের অমঙ্গলজনক। উপধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে প্রকৃতিকে যথাযথ বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার শক্তি অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হয় বলিয়া পশুবলি নরবলি প্রভৃতি ভীষণ অনিষ্টকর প্রথা সকল সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমাজকে ধ্বংসপথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে দেখা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই কারণে কুটতর্ক ছাড়িয়া প্রত্যেক মানবকে সরল পথে নিজ নিজ আত্মার ভিতর দিয়া আত্মার আত্মা পরম পিতামাতা পরমাত্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিবার উপদেশ দেন।

তৃতীয় প্রতিজ্ঞা—"রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।" আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ আত্মাকে জানিবার অধিকার রাখি, কিন্তু জড়পদার্থেরও যেমন স্বরূপ জানি না, আত্মারও সেইরূপ স্বরূপ জানি না। দর্শন, মনের নিয়মন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা আত্মার পরিচয় পাই। সেই আত্মা মহান আত্মা পরমাত্মাতে অধিশ্রিত। সুখসম্পদের মোহে আচ্ছন্ন থাকিলে অনেক সময়ে এই সত্য স্পষ্ট দেখিতে পাই না। কিন্তু দুঃখবিপদের কঠোর কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া একটা আশ্রয় পাইবার জন্য যখন ব্যাকুল হই, তখনই বুঝিতে পারি একটি আত্মাও নিরাশ্রয় নহে, প্রত্যেক আত্মাই সেই পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করি যে, বিশ্বজগতেরও আত্মা সেই পরমাত্মা; তাঁহাতেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

পরমাত্মা কেবল আত্মার প্রতিষ্ঠাভূমি নহে। আত্মা যেমন আমাদের শরীর ও মনের আশ্রয়, পরমাত্মাও সেইরূপ আত্মার একমাত্র আশ্রয়, আত্মার প্রাণ। এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, আত্মার দ্বারাই পরমাত্মাকে জানিবে। আত্মাতে ঈশ্বরকে দেখিলে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখা যায়। আত্মাকে না জানিলে সকলই শূন্য। আত্মাকে ছাড়িয়া পরমাত্মাকে পাইবে না। আত্মা সুস্থ থাকিলেই আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে জানা সহজ হয়। শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য যেমন প্রতিদিন নিয়মিত অন্ন আহার করা আবশ্যক, সেইরূপ আত্মারও স্বাস্থ্য রাখিবার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করা আবশ্যক। যেমন মাটির নীচে যথেষ্ট জল থাকিলেও গাছে নিয়মিত জলসিঞ্চন করিয়া তাহাকে সজীব রাখিতে হয়, সেইরূপ ভগবান আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া থাকিলেও নিয়মিতরূপে পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধন করিয়া আত্মাকে সতেজ করিয়া তুলিতে হয়।

এইরূপ যোগসাধনই হইল আত্মার অন্ন। মৃত্যুর পরে শরীর পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু যোগযুক্ত আত্মা পরমাত্মার সহিত অনন্তকাল বিচরণ করিতে থাকিবে। পরমাত্মার সহিত আত্মার অবিচ্ছেদ্য যোগসাধনই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের আদি এবং তাহাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্ত।

পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধনের ফলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি তো অবশ্যম্ভাবী; সঙ্গে সঙ্গে আত্মা মধুময় হয়। বিশ্বজগত সেই আত্মার নিকটে মধুময় হয়। যোগযুক্ত আত্মা শান্তিসমুদ্রে অটল থাকে। জগতের অনেক বিষয়ের কারণ ও তত্ত্ব বুঝিতে না পারিলেও, জীবনের অনেক রহস্য ভেদ করিতে না পারিলেও মঙ্গলস্বরূপের উপর তাহার বিশ্বাস কিছুমাত্র টলে না। ঈশ্বরকে যিনি আত্মস্থ দেখেন, তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ভগ্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়; মৃত্যু তাঁহাকে বিভীষিকা দেখাইতে পারে না; বিপদ তাঁহার নিকটে সম্পদ হয়, মৃত্যু অমৃতের সোপান হয়। তিনি জানিতে পারেন যে, তিনি অমৃতের পুত্র, অমৃতের অধিকারী এবং প্রকৃতই অমর; এবং ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গলময় পিতামাতা, অন্তরতম সখা ও সুহৃৎ। এইভাবে ঈশ্বরের উপাসনাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ।

এই আত্মসমাধানের জন্য যেমন ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন ব্যতীত অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ স্থান বা কালের বিষয়েও নির্দ্দিষ্ট কোন বিধিনিষেধ নাই। যে স্থানে এবং যে সময়ে যে অবস্থায় চিত্তের একাগ্রতা আসিবে, সেই স্থানে, সেই সময়ে এবং সেই অবস্থাতেই পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করিবে।

আত্মসমাধানের জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনেরও একান্ত প্রয়োজন নাই। ওঁকার বা অন্য কোন মন্ত্রের অর্থধ্যান বা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপ্রণালী বা অন্য কোন হৃদয়গ্রাহী রচনা, যাহাতে আত্মার তৃপ্তি হইবে এবং পরমাত্মাতে আত্মসমাধান সহজসাধ্য হইবে তাহাই অবলম্বন করিবে। পরমাত্মাতে আত্মসমাধান অভ্যস্ত হইলে আমরা তাঁহাকে পিতামাতা বলিয়া জানিতে পারি; বিপদের সময় তাঁহাকে বিপদের কাণ্ডারী এবং সুখে দুঃখে তাঁহাকে সখা ও সুহৃৎ বলিয়া বুঝিতে পারি। পাপে পতিত হইলে তিনি পতিতপাবন; মুক্তির জন্য শরণাপন্ন হইলে তিনি মুক্তিদাতা।

চতুর্থ প্রতিজ্ঞা হইতেছে—"সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব"; পঞ্চম প্রতিজ্ঞা—"পাপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।" আত্মসমাধানের ফলে ঈশ্বরকে প্রীতি করিবার সঙ্গে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনও সহজ হয়। তখন অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধার বলেই আমরা বুঝিতে পারি যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই তাঁহার প্রিয় এবং পাপকর্ম্ম তাঁহার অপ্রিয়। আমরা প্রত্যক্ষও করি যে, সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের ফল সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি এবং পাপকর্ম্মের ফল সর্ব্বাঙ্গীন অবনতি। ভগবানে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। মুখে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন এবং কার্য্যে তাঁহার অপ্রিয় কার্য্যসাধন—ইহাতে গুরুতর অধর্ম্ম হয়।

পাপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইলেও সীমাবদ্ধ মানুষ সময়ে সময়ে পাপাচরণ করিয়া ফেলে। কিন্তু অনন্তমঙ্গলের রাজ্যে অনন্ত নরক থাকিতে পারে না। ইহা জানা কথা যে, সংসারে নানা বিষয়ে আমরা নানা ভুলভ্রান্তি করিয়া অনেক অমূল্য সময়ও নষ্ট করি এবং অনর্থও আনি। কিন্তু তজ্জন্য বৃথা হাহুতাশ করিবার পরিবর্ত্তে মঙ্গলময়ের মঙ্গলভাবে অটল আস্থা রাখিয়া, তাঁহার হস্তে ফলাফলের ভার নির্ভয়ে সমর্পণ করিয়া নিষ্কামহৃদয়ে শুভ কর্ম্ম করিতে থাক, ভগবৎবিধানেই সমস্ত ভুলভ্রান্তি পদ্মপত্র হইতে জলের মত ঝরিয়া পড়িয়া কোথায় অদৃশ্য হইবে। মোহবশত কখন কোন পাপাচরণ করিয়া ফেলিলেও তন্নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইলে, পাপের জ্বালায় জর্জ্জরিত হৃদয়ে অনুতাপের রক্তে পরমেশ্বরের চরণ ধৌত করিলে তিনি সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া আদর পূর্ব্বক তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবেন। তাই ষষ্ঠ প্রতিজ্ঞায় পাপ করিলে তাহা হইতে অনুশোচনা পূর্ব্বক বিরত হইবার কথা আছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সর্ব্বশেষ প্রতিজ্ঞা এই যে, "ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিসাধনার্থ বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে যথাশক্তি দান করিব"। যে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রত্যক্ষ যোগবিষয়ক নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি, সেই ব্রাহ্মসমাজকে আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে। সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা, মঙ্গল ও উন্নতির পথপ্রদর্শক মোক্ষপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশের সম্মুখে যে উচ্চতম আদর্শ ধারণ করিয়াছেন, সেই আদর্শকে গৃহে গৃহে উপস্থিত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করা চাই-ই। ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ব্রাহ্মসমাজে যথাশক্তি দান করা। তাই প্রতিজ্ঞায় প্রত্যেকের পক্ষে এই দান যতদূর সম্ভব সহজ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে যে ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, বর্ষে বর্ষে যথাশক্তি দান করিলেও সে ঋণদায় হইতে আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি না। আমাদের কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ঈশ্বর ও সংসারের বিরোধ উপস্থিত হইলে সহস্র বাধা সত্ত্বেও সংসারকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া থাকিতে

হইবে। এই সকল উপায়ে যে বিদ্বান ধর্ম্মরক্ষায় যত্ন করেন, তাহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হয়।

এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবনের প্রতি নিশ্বাসে ঈশ্বরকে জীবনের সাক্ষী জানিয়া নির্ভয় হও—রোগশোক ভয়ভাবনা হইতে মুক্তিলাভ কর। তাঁহাকে মহান প্রভু বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্ববিধাতা পরম পুরুষরূপে উপলব্ধি কর—তাঁহার ইচ্ছা ও শক্তি কেহই প্রতিহত করিতে পারে না। তাঁহাকে অন্তর্যামী পরম পুরুষরূপে উপলব্ধি কর, তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত সখাসুহৃৎরূপে থাকিয়া, পিতা-মাতার মূর্ত্তিতে জাগ্রত থাকিয়া, অনুক্ষণ তোমার মঙ্গল-বিধান করিতেছেন, বিপদে আপদে তোমাকে নিজ স্নেহের ধর্ম্মদুর্গে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের ঘনিষ্টতম যোগ—তিলমাত্র ব্যবধান নাই। তিনি আমাদের প্রত্যেক কার্য্য দেখিতেছেন, প্রত্যেক কথা শুনিতেছেন। তাঁহাকে নিকটতম অন্তরতম প্রাণের প্রাণরূপে প্রত্যক্ষ কর এবং জীবনকে সার্থক কর।

সত্য না কল্পনা ?

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা চলিয়াছে। নানা প্রকার মত ও বিশ্বাসের কিরূপে উৎপত্তি হইল, বিবিধ অনুষ্ঠানাদির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য কি, ভিন্ন ভিন্ন পৌরাণিক ধর্ম্মে যে সকল ঘটনার কথা আছে, তাহার কতটা ঐতিহাসিক সত্য আর কতটাই বা রূপক ও কল্পনা, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের কোন্ কোন্ অংশ মৌলিক আর কোন্ কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত—ইত্যাদি বিষয় লইয়া যে পরিমাণে তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছে, লোকে ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য সে পরিমাণে উৎসুক নহে। ধর্ম্মের বহিরের কথা লইয়াই আলোচনা হইতেছে; কিন্তু ধর্ম্মের যাহা সার কথা, তাহা হইতে লোকে যেন ক্রমশই দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছে। ধর্ম্ম সাধনার সামগ্রী না হইয়া, শুধু আলোচনার ব্যাপারে পরিণত হইতেছে। একান্তে সঙ্গোপনে ভগবচ্চরণে না বসিয়া লোকে কেবল পরস্পরের মত ও বিশ্বাস লইয়া তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হইতেছে। পূর্ব্বকালের সরল নিষ্ঠা ভক্তি ক্রমশই অন্তর্হিত হইতেছে। সংশয় ও অবিশ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা বিনয়ের বেশ ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু এই উদারতার মূলে উদাসীনতা। লোকে ধর্ম্মকে ঈশ্বরের সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, মানবীয় সৃষ্টি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। যখন সকল ধর্ম্মই মিথ্যা, তখন যে যাহা বিশ্বাস করে করুক না, তাহাতে আর বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি কি? লোকের এই ভাব দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানের উদারতার মূলে এইরূপ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা। সমস্ত পৃথিবীময় যেন একটা সংশয়ের বায়ু বহিতেছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে সার কথা কি? সার কথা এই যে, ভগবান মানুষের প্রার্থনা শ্রবণ করেন কি না এবং ঋষি-মহর্ষিগণ তাঁহার সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য কি না? এই মূল কথার মীমাংসা না করিয়া লোকে কেবল অবান্তর কথার আলোচনায় ব্যস্ত। কেহ বলিতেছেন যে সমাজরক্ষার জন্য ধর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কেহ বা স্বীকার করিতেছেন যে ধর্ম্মভাব মানুষের প্রকৃতি-নিহিত, ইহার বিনাশ নাই। যদি কেহ বলেন যে, ধর্ম্ম বিনা মানবের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছোট থাকিয়া যায়, এবং মানবের হৃদয় যে কত উচ্চ ও কত গভীর হইতে পারে ধর্ম্মই তাহার সাক্ষী, তাহাতেও অনেকের আপত্তি নাই। ধর্ম্ম যে পাপীকে অনুতাপের আগুনে পোড়াইয়া নির্ম্মল করে, দুর্নীতি ও অনাচার হইতে উদ্ধার করে, কঠিন কর্কশ হৃদয়কে প্রেমে আর্দ্র করে এবং মানবের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে একটা উন্নত জীবনের আদর্শ স্থাপন করে—তাহাও অনেকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত। কিন্তু মানবের ধর্ম্ম-জীবন কি তাহার জাগ্রৎ অবস্থা? না, তাহার নিদ্রিত অবস্থা? মহাজনগণ যে সাক্ষাৎ অনুভূতির কথা বলেন, যে ধ্যানলব্ধ দর্শন-শ্রবণের কথা বলেন, তাহা সত্য না স্বপ্ন—সন্দেহ এই স্থলে। যাঁহারা ভূতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা যেমন অনেক সময় আপনাদেরই মনঃকল্পিত ভূত দেখিয়া ভীত হন; শোকে যাঁহারা আকুল তাঁহারা যেমন অনেক সময় মৃত প্রিয়জনের মুখ মনশ্চক্ষে দেখিয়া থাকেন; অনেকে মনে করেন যে ভক্তের হৃদয়ে ভগবান ও স্বর্গের অনুভূতিও সেইরূপ কল্পনা। এই সন্দেহ দূর করিতে না পারিলে মানব-অন্তরে ধর্ম্মের শক্তি জাগিবে না।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাসী তাহাকে যদি কেহ বলে, "হাঁ, তোমার মত ও বিশ্বাসগুলি বড় চমৎকার! তবে তোমার কাছে ওগুলি সত্য বলিয়া লাগে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ ওগুলি কিছু নয়, সমস্তই কল্পনা।" এ কথা শুনিয়া সে লোকটি সকাতরে চীৎকার করিয়া বলিবে না কি—"যাহা আমি মানি তাহা আমি সত্য বলিয়াই জানি; আমি যাহার সাক্ষ্য দিতেছি তাহা আমার জীবনের পরীক্ষিত কথা; যদি আমার সাক্ষ্য তুমি সত্য বলিয়া গ্রহণ না কর, তবে আমার মত ও বিশ্বাসগুলি বড় চমৎকার, এরূপ ভদ্রতার কথা আমার কাছে অসহ্য। পরমেশ্বর ও তাঁহার স্বর্গরাজ্য আমার কল্পনা নহে, কিন্তু স্বপ্রকাশ সত্য বস্তু। আমি ভগবানের আলোকেই ভগবানকে দর্শন করিয়াছি এবং স্বর্গের আলোকেই সেই দিব্যধাম দেখিয়াছি।" বাস্তবিক, আমরা জড় ও চৈতন্যের অন্তরালে

যে জ্যোতির্ম্ময় দেবতাকে অন্তশ্চক্ষে দেখিতেছি, অন্যে যদি তাঁহাকে না দেখে; যদি জীবনের দুর্দ্দশার দিনে আমরা নিজেরাই সেই দেবতার মুখ আবার হারাইয়া ফেলি, এবং সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া মনে করি যে, হয়ত একদিন যাহা দেখিয়াছিলাম বুঝি বা তাহা স্বপ্নই ছিল,—সেই জন্য কি আমাদের দেখা মিথ্যা হইবে? দিবালোকে যাহা দেখিয়াছি, রজনীর অন্ধকারে তাহা দেখিতে না পাইলে, দিবসের দেখা কি কল্পনা হইবে? দেখার অবস্থাকে চক্ষুর বিকার, আর না দেখার অবস্থাকে চক্ষুর স্বাভাবিক অবস্থা মনে করিবার যুক্তি কি? হৃদয়ের নির্ম্মল অবস্থায় মানুষ ঈশ্বরকে কল্পনা করে, এই কথাই সম্ভব? না, হৃদয়ের মলিন অবস্থায় পাপের কুজ্ঝটিকা ভগবানকে ঢাকিয়া ফেলে, এই কথাই সম্ভব? দুশ্চিন্তার প্রহারে যখন আমরা অধীর হই, কর্ত্তব্যের ভার যখন বড় গুরু বোঝা বলিয়া লাগে, বিবেকের যখন দুর্গতি উপস্থিত হয়, ভোগলালসা যখন প্রবল হইয়া উঠে, এবং হৃদয় যখন অবসাদে ম্রিয়মাণ হয়—তখনই ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অবিশ্বাস আমাদিগকে আক্রমণ করে। যাহারা বলে যে ধর্ম্ম স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, ভগবান মানুষের সুললিত কল্পনা মাত্র,—তাহাদের কথায় আমরা এই উত্তর দিব যে, আমাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাসই আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্গতির ছায়া, আমাদের পাপই মেঘের আকার ধারণ করিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আচ্ছন্ন করে।

বিশ্বাসের দ্বারা আমরা প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত হই বা সন্দেহের দৃষ্টি আমাদিগকে সত্যদর্শনে সমর্থ করে, এ প্রশ্ন যে শুধু ধর্ম্মের বেলাতেই উঠে, তাহা নহে। জীবনের যে বিভাগেই প্রীতি ভক্তি সৌন্দর্য্য ও আনন্দের কথা আছে, সেইখানেই আমাদের বিশ্বাস ও সন্দেহ, আমাদের দর্শন ও অন্ধতা—আমাদের হৃদয়ের অবস্থার উপর নির্ভর করে। ধর্ম্মরাজ্যের বাহিরেও তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এমন লোক আছেন, যাঁহার কাছে একটি উচ্চ ভাবের কবিতা পাঠ কর, তিনি ঐ কবিতাটির ভাবের সৌন্দর্য্যে বিহ্বল ও আত্মহারা হইবেন, কবিতাটি শুনিবামাত্র তাঁহার অন্তরের নিভৃতে যেন কত স্বর্গীয় সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিবে; কিন্তু আবার এমন লোকও আছেন যিনি ঐ কবিতাটির মধ্যে মুগ্ধ হইবার মত কোন-কিছুই খুঁজিয়া পাইবেন না। একটী রমণীর মুখে তুমি দেখিলে কত লাবণ্য, কত স্নেহ-করুণা, কত স্বর্গের পবিত্রতা; আর আমি দেখিলাম ললাট ও গণ্ড, নাসিকা ও চিবুকের গঠন ও বর্ণ। আমার দৃষ্টিশক্তি উত্তম হইতে পারে, কিন্তু ঐ মুখখানিতে যাহা দেখিবার আছে তাহা দেখিল কে? আমাদের দুইজনের দেখার মধ্যে যে প্রভেদ তাহার মূলে বহিশ্চক্ষুর ভিন্নতা নয় কিন্তু হৃদয়ের ভিন্নতা। একজন সাধারণ লোকের মৃত্যু হইলে যাহারা তাহাকে অল্প অল্প চিনিত তাহারা শুষ্কভাবে তাহার দোষ ও গুণের আলোচনা করে; কিন্তু তাহার আত্মীয়স্বজন তাহার সদ্গুণের কথাই স্মরণ করেন; তাঁহারা যে ঐ ব্যক্তির দোষদুর্ব্বলতার কথা জানিতেন না তাহা নহে, বরং বাহিরের লোক অপেক্ষা অনেক অধিক জানিতেন; কিন্তু সে কিরূপ প্রলোভন ও ঘটনাচক্রে পড়িয়া সুপথ হইতে স্খলিত হইয়াছিল, নিজের অপরাধের জন্য সে কত লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিল, সে ভাল হইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিল—এসব কথা বাহিরের লোকে জানিত না কিন্তু তাঁহারা জানিতেন। তাই আজ তাঁহারা প্রেমের সহিত তাঁহার সদ্গুণের কথাই স্মরণ করিতেছেন এবং দিব্যধামবাসী সাধুদের মধ্যে আজ তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। অরণ্য ও পর্ব্বতের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য, সমুদ্রের নীলকান্তি ও উত্তাল নৃত্য ভাবুকের প্রাণকে অপার আনন্দে প্লাবিত করে কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য অপর একজনকে স্পর্শমাত্রও করে না। প্রেমভক্তির চক্ষে প্রকৃতির মুখে যে শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখা যায়, তাহা কি সত্য, না তাহা কল্পনা? যাহা নাই তাহাও আমরা কখন কখন কল্পনা করি সত্য, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যাহা আছে তাহাও আমাদের হৃদয়ের অন্ধতাবশতঃ আমরা দেখি না। সময়ে সময়ে হঠাৎ যেন আমাদের চমক ভাঙ্গে, আমরা নিজ নিজ হৃদয়ের অন্ধকার কূপ হইতে উঠিয়া যেন একটা উদার উন্মুক্ত রাজ্যে উপনীত হই ও দিব্যদৃষ্টি লাভ করি। একবার যখন আমরা প্রকৃতির সেই মাধুর্য্য ও লাবণ্য দর্শন করি তখন আর বুঝিতে বাকী থাকে না যে ইহা মিথ্যা নয়, কল্পনা নয়, হৃদয়ের প্রতারণা নয়, কিন্তু ইহাই সত্য। শুধু হৃদয়ের অন্ধতা ও অসাড়তা বশতঃই এতদিন ইহা দেখি নাই।

বিশেষ ধর্ম্মের যাহা সার কথা, হৃদয়কে ছাড়িয়া শুধু চক্ষুকর্ণে ও বুদ্ধির সাহায্যে, তাহা বোধ হয় আমরা ধরিতে পারি না। এই ব্রহ্মাণ্ড যদি সত্যই একটি প্রাণহীন যন্ত্র হইত; প্রকৃতি যদি পরমাণুপুঞ্জের রঙ্গভূমি হইত; যদি জীবন-মৃত্যুর অন্তরালে কেবল অন্ধ জড়শক্তি থাকিত; যদি সৃষ্টির পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য না থাকিত; যদি ঘূর্ণ্যমান গ্রহ-উপগ্রহগণ কেবলমাত্র নিয়তির তালে তালে নৃত্য করিত; যদি সুস্নিগ্ধ ঊষালোকে স্নেহ-করুণার বার্তা না থাকিত; যদি বায়ুর হিল্লোল ও নির্ঝরিণীর কলতান ভাবহীন ও অর্থহীন হইত; যদি মানবের আশা, শোক ও বিবেক কেবল স্নায়ুর স্পন্দন মাত্র হইত—তাহা হইলে জগৎ সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইত, জগতে বুদ্ধির অগম্য ও চক্ষু-কর্ণের অগোচর

কিছুই থাকিত না। কিন্তু বিশ্বের অন্তরালে বিধাতা আছেন, এই কথা যদি সত্য হয়; প্রকৃতি যদি মানবাত্মা ও পরমাত্মার যোগের সেতু হয়; যদি বিশাল জলধিবক্ষে ও নক্ষত্রখচিত নীরব নৈশাকাশে তাঁহার পরিচয় থাকে; যদি এই দৃশ্যমান বহির্জ্জগৎ ও এই অতীন্দ্রিয় সুগভীর মানবের অন্তর্জ্জগৎ তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানের নিদর্শন হয়; বিবেক তাঁহারই বাণী—একথা যদি সত্য হয়; জীবনের শোক দুঃখ পরীক্ষার মধ্যে যদি দৃঢ়তর নির্ভর ও বিশ্বাসের জন্য তাঁহার আহ্বান থাকে; যদি পবিত্রতার আগামনী আকাঙ্ক্ষা তাঁহারই পুণ্যস্পর্শ হয়—তবে তাঁহার সহিত আমাদের ইচ্ছার যোগ ব্যতীত, কি বহির্জ্জগৎ কি অন্তর্জ্জগৎ, কিছুরই রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের অসাধ্য।

আমাদের মনের অবস্থা কখন ভাল কখন বা মন্দ হয়। হৃদয় কখন প্রেমে সরস, উৎসাহে জীবন্ত, আনন্দে পূর্ণ থাকে; আবার কখন হৃদয়ের এমনি দুর্গতি হয় যে, কোন কিছুরই ভাল দিক আমরা দেখিতে পাই না, কিছুতেই আনন্দ পাই না, কোন কাজেই উৎসাহ থাকে না, মনটা যেন পাষাণবৎ কঠিন হইয়া যায়। এই দুইটি অবস্থার মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থাই কি আত্মার প্রকৃত অবস্থা, আর প্রথমটিই কি বিকৃতি? যখন এইরূপ দুর্দ্দশা চলিয়া যায়, তখন কি মনে হয় না যে, হৃদয়ের মধ্যে যে অন্ধকার দেখিতেছিলাম, তাহা আমাদেরই হৃদয়-নিচিত মেঘের ছায়া?

শুধু চক্ষু থাকিলেই হইবে না, শুধু বাহির দেখিলেই চলিবে না; জগতের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে হইলে হৃদয়ের প্রয়োজন—বিধাতার গভীর মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝিতে হইলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং দর্শন-বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য অপেক্ষাও নিঃস্বার্থ সরল হৃদয়ের প্রয়োজন।

দেখিবার ও শুনিবার শক্তি অনেক ইতর প্রাণীরও আছে। মানুষ কি শুধু পশু-পক্ষীর মত চক্ষু-কর্ণের বার্ত্তা গ্রহণ করিবে এবং বিবেক ও হৃদয়ের বাণী তুচ্ছ করিবে? গরু ভেড়াও ত পাহাড়-পর্ব্বত, বৃক্ষলতা দেখিতে পায়; অরণ্যের মর্ম্মরধ্বনি ও সমুদ্রের গম্ভীর নির্ঘোষ তাহাদেরও কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রকৃতির চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া তাহার পশ্চাতে অনন্ত স্বরূপকে তাহারা দেখে না। তবে যে গৌরব ও মহিমা দেখিয়া তোমার কণ্ঠ হইতে বন্দনার গীত উত্থিত হইতেছে, তাহা কি মিথ্যা? যে স্বর্গীয় শোভায় মুগ্ধ হইয়া তুমি নিস্তব্ধ ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেছ, যেন অরণ্য পর্ব্বত ও আকাশের মর্ম্মস্থল হইতে কি এক অদৃশ্য প্রবাহ আসিয়া তোমার হৃদয়কে আলিঙ্গন করিতেছে—ইহা কি মিথ্যা? এরূপভাবে মুগ্ধ হওয়া মানবেরই ত বিশেষ অধিকার। কিন্তু ইহা যদি মিথ্যা হয়, তবে ত মানুষ অপেক্ষা গরু-ভেড়াকেই শ্রেষ্ঠ মানিতে হয়; কারণ এ সব মিথ্যা বিড়ম্বনা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

দেখা তবে দুই প্রকার। একদিকে বুদ্ধি ও চক্ষুর সাহায্যে বাহ্যদর্শন, অপর দিকে প্রেম ও ভক্তির আলোকে অন্তর্দৃষ্টি। পুণ্য, শান্তি, কোমলতা, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি ভাবের বিষয় বহিশ্চক্ষুর অগোচর। হৃদয়কে বিদায় করিয়া দেও, মানবজীবন ও প্রকৃতির রহস্য তোমার নিকট নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য হইবে। এক একজন সাধুর উপদেশে বা ভক্তের গানে কত পাপীর জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আবার সেই গান ও সেই উপদেশ কত লোককে স্পর্শমাত্রও করে না। এই বিভিন্নতার মূলে একজনের শ্রদ্ধা ও দ্বিতীয় ব্যক্তির শ্রদ্ধার অভাব। যদি মানুষের কথা বুঝিবার জন্য এত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ভক্তির প্রয়োজন, তবে কি বলিব যে আমাদের আত্মার আত্মা যিনি, অসীম প্রকৃতির কাব্যের কবি যিনি, যাঁহার বিধানে এক দিকে ঊষার সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে, অপর দিকে আমাদের হৃদয়-বীণায় সেই সঙ্গীতের ঝঙ্কার বাজিতেছে—সেই ভগবানের সুগম্ভীর বাণী শুনিবার ও বুঝিবার জন্য কি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের প্রয়োজন নাই?

যখনই নিভৃত চিন্তা বা কর্ত্তব্যের প্রেরণা বা শোকের কশাঘাত আমাদিগকে জীবনের উচ্চভূমিতে লইয়া যাইবে, এবং অন্তরের অন্তরে একটা অস্ফুট স্বর্গীয় ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকিবে, তখন কে আমাদের নিকটে আসিয়াছেন, তাহাতে যেন আমরা সন্দেহ না করি। সেই ধ্বনি আমাদের নিজের নয়। সে ধ্বনি আমাদের কল্পনা নয়। তখন যেন আমরা ভক্তিভরে ভগবচ্চরণে প্রণাম করি। জীবনের হীন অবস্থায় যে অবিশ্বাস ও অন্ধকার আমাদিগকে আক্রমণ করে তাহাকেই যেন আমরা মিথ্যা বলিয়া মনে করি, এবং শুভমুহূর্ত্তে এই অবিশ্বাস ও অন্ধকার ভেদ করিয়া যে স্বর্গের আলোক আসিবে তাহাকে সারাৎসার সত্য জানিয়া তাহাকে মানবাত্মার পরমাত্মার পুণ্য স্পর্শ জানিয়া, তাহাকে স্বপ্রকাশের আবির্ভাব জানিয়া আমরা যেন সেই আলোকের নিকট হৃদয় উন্মুক্ত করিতে পারি।

Lord Buddha's Message

OF

WORLD-PEACE

ACHARJYA Sj. KSHITINDRA NATH TAGORE

[The following was delivered by Acharya Sj. Kshitindra Nath Tagore from the chair,

when presiding over the "Buddhastami" meeting of the Bubdhist Indian Society at the Mahabodhi Society Hall on the 16th instant]

When virtue is on the wane and vice reigns rampant, it is then that the benign Providence sends to this earth a great man endowed with His power to re-establish spirituality and to secure bliss to the people. In this way, age after age, great men have come, each with his own great message, which finds a ready response in the heart of men of his era.

Since the last great European War, it is the message of peace which is ready there to receive response from the whole world. When this message of peace is being proclaimed by practically all the nations of the world; when the whole world is busy in explaining the good effect of the World-peace, when and if established, the mind's eye of the Indians goes back to those far-off times, when perhaps out of the disgust and repugnance arising from the then internecine quarrels, the hearts of the people of India yearned for peace, there arose the Lord Buddha with his grand message of peace.

It was his bright torch of peace, which drove away the impenetrable darkness of ignorance and brought the bliss of peace in place of bloody feuds and quarrels; the sweetscented rose of brotherly feeling blossomed forth from the ashes of deadly hostilities.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE

So far as we understand it, the fundamental principle of Buddism is—Peace first, peace second, and peace last. The religion that has the establishment of peace as its goal, very naturally took to antiviolence as its means of propagation. The result of its this form of propagation was the establishment of hundreds of "Bihars" and wonder-inspiring rock-cut temples. It is this idea of peace and its inevitable corollary of doing good to others, that led the great King Asoka to adopt Buddhism and arrange for its propagation far and wide through good works. It is the peaceful penetration, not in the sense of its modern political propagandists, but in its true sense, of Buddhism, that has made it a standard religion for ages, not only in India, its fountain head, but also in the far-off continents like America and the far-off countries like Tibet, China and Japan.

About half a century ago or more, the Savants of the West took a sudden predilection to this religion, perhaps having noticed all over the world the grand things it has been able to bring about, and began to study it assiduously. The results of their study and research were disseminated throughout the world, more particularly among the nations of the West. The educated communities of the West, I may say, were saturated with the sober and peacemaking ideas of Buddhism. Who can say that it is not this Buddhistic culture that helped a good deal in the speedy termination of the last great war?

IS IT ATHEISM?

This religion, which brings solace and peace to hundreds of milions of people, is often and anon spoken of as God-denying religion. I could not believe it and from whatever little I have studied of Buddhism, I have come to this conclusion that it is not at all a God-denying religion. The only thing that can be said in this matter is, to my mind, that the Buddha would not argue or bandy words either for or against the existence of God, as that was likely to bring about unnecessary and useless disputes and quarrels, which were perhaps in evidence in his time to superfluity. From his conversation with the Brahmin Vasistha, it appears that the Lord Buddha drew out from him the true conception of the Godhead. Had he been an atheist in his heart, he would never have done so.

The real aim of Buddhism is to lead people to do good works and as a great help towards this, to adopt renunciation and asceticism. To my mind, this seems to be the central point of the teachings of Buddha. Not that this idea could not be found in the more ancient Shastras of the Hindus, but that it cannot be gainsaid that it was the Lord Buddha who laid special emphasis on this point. In fact, we find, it is those truths from Hinduism that have been given special emphasis and more particularly

dilated upon by Lord Buddha, that have come to stay as the fundamental truths underlying Buddhism.

AN APPEAL

In conclusion, what I have to urge is to ask both the Hindus and the Buddhists not to look askance at each other, but to extend to each other hands of fellowship, when the sweet morning breeze of unity has commenced to blow not only in Bengal, not only in India, not only in the East, and not only in the West, but in the whole world; and by trying to do good to ourselves and to our neighbours, bring about the fulfilment of the purpose of the Lord Buddha's advent to this world. Let the Hindus remember that it is *their* Lord Buddha, it is one of the incarnations of the God *they* worship, whose teachings have been accepted by the hundreds of millions of people living beyond the Himalayas. At the same time, let Buddhists all over the world ponder well that it is *India* that produced the Lord Buddha, and it is the great teachers of Buddhism like Dipankar, who were born in *Bengal* and went to preach this great religion without the least fear not only to the inhabitants of the Near-East, e. g. Tibet, China and Japan, but even to those of the far-West, America and other places.

Let us forget our differences and embrace each other and re-conquer our lost throne by our united effort and place once more the crown of ancient glory on the head of the East, the mother of all religions.*

কুরুসিংহাসনের উত্তরাধিকার।

(শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম-এ, বি-এল)

মহাভারতের আখ্যায়িকাভাগের মূল সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা ভুল।

মহাভারতের আখ্যায়িকাভাগের মূল সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এই যে, কুরুপাণ্ডবের মধ্যে যে কুরুক্ষেত্র মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা হস্তিনার কুরুসিংহাসন লইয়া; এবং দুর্য্যোধনের দুর্নীতি ও উক্ত সিংহাসনে তাঁহার অন্যায় দাবীর জন্যই—তাঁহার দোষেই—ভারতের ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী উক্ত ভয়াবহ যুদ্ধ সম্ভব হইয়াছিল এবং যুধিষ্ঠিরই উক্ত সিংহাসনের প্রকৃত ও ন্যায্য অধিকারী ছিলেন।

ধীরভাবে মহাভারত-পাঠে দেখা যাইবে যে সমগ্র মহভারতের লক্ষ্য বা কেন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে এক ধর্ম্মরাজ্য বা মহাভারত সংগঠন বা স্থাপন। তদুদ্দেশ্য সাধনার্থ শ্রীকৃষ্ণ তদানীন্তন রাজনীতিক্ষেত্রে যে দাবা-খেলার "চাল" পাতিয়াছিলেন, তাহাতে কুরুসিংহাসন তথা কুরুপাণ্ডবের এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ইতিহাস একটা উপলক্ষ্য বা পণ মাত্র। খেলোয়াড় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

মহাভারতের এই লক্ষ্যস্থল নানা ঘটনার ও বিষয়ের অন্তরালে যেন রক্ষিত। এই অন্তরাল ভেদ করতঃ লক্ষ্যস্থলে পৌছিলে মহাভারত-রচয়িতার অপূর্ব্ব কৌশল, সৌন্দর্য্যজ্ঞান ইত্যাদির পরিচয়লাভে ধন্য হইতে পারা যাইবে এবং মহাভারত বোঝা সহজ হইবে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও তৎস্থাপিত ধর্ম্মরাজ্য বা মহাভারতের বিষয় যথাস্থানে আলোচনার জন্য রাখিয়া এক্ষণে অগ্রে উক্ত অন্তরালগুলি ভেদ করা দরকার। তদুদ্দেশ্যে প্রথমেই কুরুপাণ্ডবের কথা আলোচনা করিব।

সবিশেষ প্রণিধান-পূর্ব্বক মহাভারত-পাঠে আরও জানা যাইবে যে, দুর্য্যোধনের দোষ ও দুর্নীতি এবং তাঁহার ও যুধিষ্ঠিরের দাবী প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণের অনেক ভুল ধারণা আছে; কারণ যৎকালে কুরুসিংহাসন লইয়া উক্ত বিবাদের সূত্রপাত হয়, তৎকালে কুরু-সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী ছিলেন দুর্য্যোধন এবং তাঁহার দাবীই যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত ছিল,—যুধিষ্ঠিরের দাবী একেবারেই অন্যায় ছিল।

হস্তিনার কুরুসিংহাসনে কাহার দাবী ন্যায্য—ধার্ত্তরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের অথবা পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের?

সাবধানে মহাভারত-পাঠে জানা যায় যে মহারাজ পাণ্ডু বনগমনকালে সিংহাসন ত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে উহা দান করতঃ তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। পরে বনবাসকালে—পাণ্ডবগণের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বেই পাণ্ডু প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুতরাং আইনের দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে বলিতে হয় যে, যে জিনিস একবার দান করা যায় তাহাতে দাতার আর কোন স্বত্ব-স্বামিত্বাদি থাকে না। অতএব দান করার ফলে দাতার তাহাতে কোনও অধিকার না থাকায় দাতার জাত সন্তানিদেরও তাহাতে আর কোনও দাবী-দাওয়া থাকা সম্ভব নয়।

পুনশ্চ—কেহ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে বা সন্ন্যাসী হইলে তাঁহাকে বিষয়সম্পত্তি আদি ত্যাগ করিতে হয় এবং তাহাতে একজন না একজন উহার অধিকারী

* Liberty 19. 5. 29.

দাঁড়ান; তখন এই শেষোক্ত ব্যক্তিতে কোনওরূপে ঐ ত্যক্ত সম্পত্তি অর্শাইলে, পরে উক্ত সন্ন্যাসী বা তাঁহার সম্পত্তি আদি ত্যাগের পর উদ্ভূত সন্তানগণ আর উক্ত সম্পত্তি ফেরৎ পাইতে পারেন না।

অতএব আইনতঃ দেখা যাইতেছে যে, পাণ্ডু কর্তৃক দানকৃত কুরুসিংহাসনে পাণ্ডুপুত্রগণের কোনই অধিকার ছিল না; সুতরাং তাঁহারা তাহা ফেরৎ পাইবারও দাবী করিতে পারেন না।

এক্ষণে মহাভারতের ঘটনাবলী হইতে উক্ত সিদ্ধান্ত সমীচীন কি না তাহা দেখা ও বোঝা দরকার; এবং তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রশ্নটি সংক্ষেপে পুনরায় বলিয়া রাখি, উহা এই—হস্তিনার কুরুসিংহাসনে ন্যায্য দাবী কাহার—পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অথবা ধার্ত্তরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের?

১।

শান্তনুর বংশাবলী—পাণ্ডুর রাজ্যলাভ।

মহাভারত (আদি, সম্ভব—৯৯ হইতে ১০৯ অধ্যায়) হইতে জানা যায় যে মহাত্মা শান্তনুর তিনপুত্র—গঙ্গাদেবী-গর্ভে গাঙ্গেয় দেবব্রত, ইনি পরে ভীষ্ম নামে খ্যাত হন; এবং সত্যবতীগর্ভে—চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য। ভীষ্ম সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করায় শান্তনুর দেহান্তে চিত্রাঙ্গদ রাজা হন। গন্ধর্ব্বসহ যুদ্ধে তিনি নিহত হইলে অপুত্রকবিধায় তাঁহার কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্য সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত বিচিত্রবীর্য্য অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করিলে তাঁহার ক্ষেত্রে বিচিত্রবীর্য্যের জননী সত্যবতীর কানীন-পুত্র মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে তিন পুত্র জন্মলাভ করিয়াছিলেন—জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, মধ্যম পাণ্ডু ও দাসীগর্ভসম্ভূত বিদুর সর্ব্বকনিষ্ঠ। "ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, বিদুর পারসব সুতরাং পাণ্ডুই সিংহানে অধিরূঢ় হইলেন।" (ঐ ঐ ১০৯ অধ্যায়)

এই স্থলে "সুতরাং" শব্দের ব্যবহার দৃষ্টে বোধ হইবে যে, পাণ্ডুর পূর্ব্বে কুরুসিংহাসনে তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার দাবী বিচারপূর্ব্বক তাঁহারা অনধিকারী বিবেচিত হওয়ায় এবং বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীদ্বয়ও বেদব্যাসের সহবাসে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনে অনিচ্ছুক থাকায় কুরুগণ যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই "অগত্যা" পাণ্ডুকেই সিংহাসন দিয়াছিলেন।

২।

পাণ্ডুর বনগমন—দানসূত্রে ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যলাভ।

মহারাজ পাণ্ডু কিয়ৎকাল রাজ্যবৃদ্ধি ও ভোগ করণান্তর তাঁহার দুই মহিষী কুন্তী ও মাদ্রী সহ বনগমন করিয়াছিলেন।

মহাভারতে (উদ্যোগ, ভগবদ্যান, ১৪৪ অধ্যায়) দৃষ্ট হইবে যে কুরুসভাপ্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণ বিরাটালয়ের সভামধ্যে, কুরুসভায় দ্রোণের উক্তি যুধিষ্ঠিরকে শুনাইতেছেন। উক্ত শ্রীকৃষ্ণ-কথিত দ্রোণ-বচনে দেখা যায় যে, পাণ্ডু জ্যেষ্ঠভ্রাতা "ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে সংস্থাপন পূর্ব্বক ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। ... বিদুর বিনীতভাবে কিঙ্করের ন্যায় চামর ব্যজন দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। সমুদয় প্রজাগণ নরাধিপতি পাণ্ডুর ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ... মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনস্থ হইয়া মহামতি বিদুরের পরামর্শানুসারে অন্যান্য রাজকার্য্যসকল পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।"

উপরি উদ্ধৃত দ্রোণবাক্যমধ্যে যে কথাগুলির নিম্নে দাগ দেওয়া (underlined) হইল, ঐ কথাগুলির উপর মনোযোগ দিয়া উক্ত উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে:—(১) বনগমনকালে পাণ্ডু তদীয় অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে "সংস্থাপন" অর্থাৎ চলিত ভাষায় বসাইয়া দিয়া বা দান করিয়া গিয়াছিলেন। (২) [তৎকালে প্রজাগণের অনভিমতে কেহই রাজা হইতে পারিতেন না; সুতরাং প্রজাগণের রাজা মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা ছিল (প্রবন্ধান্তরে দ্রষ্টব্য) ইহা স্মরণ রাখিয়া বুঝিতে হইবে যে,] বিদুর ও প্রজাগণ ধৃতরাষ্ট্রকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। (৩) সিংহাসনস্থ হওয়ার পর ঐস্থলে ধৃতরাষ্ট্রকে "নরপতি" বলিয়া উল্লেখ আছে; এবং (৪) তিনি "সিংহাসনস্থ" হইয়া রাজকার্য্য চালাইতে লগিলেন।

ক্ষুদ্র হইলেও একটা কথা এইস্থানে মনে রাখা উচিত যে, পাণ্ডুর রাজত্বকালে সিংহাসনাধিষ্ঠিত পাণ্ডুকে "মহারাজ" এবং ধৃতরাষ্ট্রকে "রাজা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; যথা,—উক্ত "রাজা" (ধৃতরাষ্ট্র) মহারাজ "পাণ্ডুর প্রভাবে বহুদক্ষিণ শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিলেন" (মহাভারত আদি, সম্ভব ১১৪ অধ্যায় ও অন্যত্র)। কিন্তু পাণ্ডুর সিংহাসনাদি ত্যাগের পরে ধৃতরাষ্ট্র "মহারাজ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কেন? উত্তর মনে হয় এই যে, যৎকালে পাণ্ডু রাজত্ব করিতেন তৎকালে তিনিই "মহারাজ" বলিয়া অভিহিত হইতেন; এবং তিনি রাজ্য ত্যাগ করিবার পর হইতে অথবা যখন হইতে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর প্রদত্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, তদবধি তিনিই "মহারাজ" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা ও উদ্ধৃতাংশ হইতে প্রতীতি হইবে যে, ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধত্বপ্রযুক্ত সিংহাসন প্রথমে না

পাইলেও তাঁহার কনিষ্ঠ ও রাজ্যপ্রাপ্ত মহারাজ পাণ্ডুর নিকট দানসূত্রে পরে উহা প্রাপ্ত হন।

সম্ভবতঃ এই জন্যই মহাভারত আদি পর্ব্বের ১১৪ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে, পাণ্ডুর বনবাসকালে "তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত ধৃতরাষ্ট্র-প্রেরিত ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিত।" পাণ্ডু যদি রাজ্যত্যাগ না করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই লিখিত হইত যে, পাণ্ডুর ভৃত্যগণই তাঁহার প্রয়োজন সাধন করিত। কিন্তু পাণ্ডু রাজ্য ত্যাগ করা হেতুই "ধৃতরাষ্ট্র-প্রেরিত ভৃত্যগণের" কথা সম্ভবত উল্লিখিত হইয়াছে।

৩।

পাণ্ডুর প্রব্রজ্যাগ্রহণ।

আরও একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে এই স্থলে দ্রষ্টব্য। বনে কিয়ৎকাল সপত্নীক বাসান্তর পাণ্ডু সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ হস্তিনাপুরে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন যে তিনি "আর তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন না"।

প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিলে হিন্দুশাস্ত্র বা আইন ও প্রথানুসারে সম্পত্তি আদি ত্যাগ করিতে হয়। তর্কস্থলে যদিই বা ধরিয়া লওয়া হয় যে, প্রব্রজ্যাগ্রহণকালে সম্পত্তি বা রাজ্যাদিতে পাণ্ডুর কোনও স্বত্বাদি অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইলে ইহাও সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করায় রাজ্যাদিতে পাণ্ডুর যাহা কিছু স্বত্ব-স্বামিত্বাদি অবশিষ্ট ছিল তৎসকলই তৎকর্ত্তৃক তৎকালে নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

প্রব্রজ্যা-গ্রহণকালের বহু পরে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পঞ্চপুত্রের জন্ম হইয়াছিল; সুতরাং সন্ন্যাসগ্রহণকালে পাণ্ডুর নিজাধিকারাদি উক্ত পুত্রগণের অনুকূলে পরিত্যাগ বা দান করা সম্ভবপর ছিল না এবং তিনি তাহা করেনও নাই।

সুতরাং পাণ্ডু যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, আর ফিরিলেন না তখন সিংহাসনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? সিংহাসনাধিষ্ঠিত রাজা না থাকায় রাজ্য অরাজক হইয়াছিল অথবা অপর কেহ রাজা হইয়াছিলেন? পাণ্ডুই বা তাঁহার ভবিষ্যৎ অধিকারী 'কে' হইবেন, প্রব্রজ্যাগ্রহণকালে তাহা নির্ণয় করিয়া দেন নাই কেন? এই সকল প্রশ্ন স্বতই এস্থলে মনে উদয় হয়।

এক্ষণে এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা যথাসম্ভব মহাভারত হইতেই দেখা যাক। উত্তরার্থ শেষ প্রশ্নটী প্রথমেই গ্রহণ করা যাইতেছে।

প্রব্রজ্যার সংবাদ হস্তিনায় প্রেরণকালে পাণ্ডু যে তৎসিংহাসনের অধিকারী কে হইবেন ইহা নির্ণয় করিয়া দেন নাই, তাহার কারণ আমার মনে হয় একমাত্র ইহাই যে, তিনি বনপ্রস্থানকালের পূর্ব্বেই স্বীয় অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসন দান করিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং প্রব্রজ্যাগ্রহণকালে তাহা পুনরায় নির্ণয় করিবার আর কোন আবশ্যক হয় নাই এবং পাণ্ডুও তাহা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

প্রথম দুইটী প্রশ্নের উত্তর এই যে, তৎকালে ও তৎকালের পূর্ব্বে ও পরে ধৃতরাষ্ট্রই সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন; সুতরাং রাজ্য অরাজক হয় নাই। মহাভারতে (আদি, সম্ভব—১০২ অধ্যায়) দৃষ্ট হইবে যে মহাত্মা শান্তনুর দেহান্ত হইলে পর "ভীষ্ম সত্যবতীর মতানুসারে চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলে পর ভীষ্মই বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ও পরম যত্নে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে ত্রুটী করিতেন না। বিচিত্রবীর্য্যও ভীষ্মের আদেশানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন"। বিচিত্রবীর্য্যের যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর পর সত্যবতী তৎকালে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত ব্যাসদেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্যাসদেবের সহিত কথোপকথন সময়ে সত্যবতী বলিয়াছিলেন যে "অকালিক পুত্র জন্মিলেও ভীষ্ম তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন"। (মহাভারত, আদি, সম্ভব—১০৫ অধ্যায়) উক্ত আদিপর্ব্বের ১০৯ অধ্যায়ে পুনশ্চ দৃষ্ট হইবে যে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্রগণকে ভীষ্মই প্রতিপালন ও রাজ্য পরিরক্ষণ করিয়াছিলেন।

সুতরাং পাণ্ডু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে পর রাজ্য যদি অরাজক হইত, তাহা হইলে রাজ্যের বিশেষ ব্যবস্থা অবশ্য ভীষ্মকেই করিতে হইত, এবং মহাভারতেও তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হইত। কিন্তু এবম্প্রকার ব্যবস্থা করিতে হয় নাই বা করিবার প্রয়োজনও হয় নাই। কেন? উপরে শেষ প্রশ্নের উত্তর যাহা, এই প্রশ্নেরও উত্তর তাহাই অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর নিকট দানসূত্রে রাজ্য ও সিংহাসন প্রাপ্ত হওয়ায় এরূপ কোন ব্যবস্থার আদৌ আবশ্যক হয় নাই।

পাণ্ডু কর্ত্তৃক সন্ন্যাসগ্রহণের বহুকাল পরে অরণ্যে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পঞ্চপুত্র জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং পুত্রগণের জন্মের বহু পূর্ব্বেই যে সম্পত্তি পাণ্ডু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে অন্য মালিক তাঁহার স্বত্বাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে পাণ্ডুপুত্রগণের আর কোনও ন্যায্য দাবী রহিতে পারে কি?

রাজকুমার বেস্‌সন্তর।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ)

বুদ্ধজন্ম বাদ দিয়া বোধিসত্বের মর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বশেষ জন্ম বেস্‌সন্তর * রূপে। বেস্‌সন্তর জন্মাবধি ধ্যানপরায়ণ।

* বেস্‌সন্তর—বিশ্বন্তর।